সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা

মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক

সময় রেখায় বঙ্গবন্ধু : সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে

প্রকাশক: শিলালিপি

+৮৮ ০২ ৫৮১৫৪৫০৫-৭, cep@shilalipi.com

দীর্ঘ সময়, অন্তত কয়েকশ বছর ধরে যে বন্দীত্বের অচলায়ন তৈরি হয়েছিল, তা ভেঙে মুক্তির পথ তৈরি করতে বলতে গেলে পুরো জীবনটাই সংগ্রাম করেছেন বঙ্গবন্ধু।

তাঁর সংগ্রামের পথ ধরেই বাঙালির একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর সেই সংগ্রামের বৈশ্বিক বা মহাকালিক গুরুত্বের জায়গাটি হচ্ছে তিনি একটি নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে অবিশ্বাস্য মুক্তি এনে দিয়েছিলেন। হাজার বছরে তাঁর হাত ধরে প্রথম বাঙালি পেয়েছিল স্বশাসন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ।

এরপর তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার প্রক্রিয়ায়, স্বপ্ন দেখেছিলেন দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত বাঙালি জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বিশ্বের বুকে। কীভাবে একটি স্থানিক সমস্যার সমাধানে দায়িত্ব নেওয়া থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে গোটা বিশ্বপ্রেক্ষিতে তিনি নিপীড়িত মানবমুক্তির আন্দোলনের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন, তার অপরিমেয় অভিজ্ঞানমূল্য আজ বিতর্কাতীত।

আজ এত বছর পর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যারা কথা বলেন, তাঁর স্মৃতিচারণ করেন, তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরতে চান, দুয়েকজন ব্যতিক্রম বাদে তাদের অধিকাংশের কাছ থেকেই বঙ্গবন্ধুর গোটা জীবনের ওপর যে সাধারণ জানাশোনা প্রত্যাশিত, তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

কিন্তু তাদের এ নিয়ে দোষ দেওয়া যায় না। তার কারণটাও ঐতিহাসিক। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর, তাঁর আদর্শের রাষ্ট্রের স্তম্ভগুলো উপড়ে ফেলার পর যে বাতাবরণগুলো দিয়ে তার কীর্তিগুলোকে ঢেকে ফেলার অপচেষ্টা হয়েছিল, তার মধ্যে আমরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মিথ্যাচার যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি অতি-উৎপাদন বহু অসার আলোচনার।

এ প্রেক্ষিতে "সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে: সময় রেখায় বঙ্গবন্ধু", আমাদের জন্য আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছে। শিরোনামটি তাৎপর্যবহ তার সাংকেতিক যাথার্থ্যের দিক থেকে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে আগুন তিনি সমগ্র বাঙালি জাতিসত্তার চেতনায় জ্বালিয়েছিলেন তার প্রজ্জ্বলনের ঘটনা তাঁর কিশোর জীবনেই ঘটেছিল। এই আগুন দিয়ে তিনি দূর করেছিলেন বহু শতক ধরে চেপে থাকা পরাধীনতার অন্ধকার। তা দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন পরশাসন ও উপনিবেশের বুনিয়াদ। সেই আগুনে জ্বলেছিল আলো। তাতে বাঙালি ঘৃণার উর্ধ্বে, এক ধরনের সাম্যবোধে, মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল জনগোষ্ঠী। প্রমিথিউসের অমরগাথার মতো তাঁর লড়াকু জীবনের সমস্ত ঘটনা যেন কাব্যরূপ পেয়েছে এই বইয়ের শিরোনামে।

বঙ্গবন্ধুর ওপর সুগ্রন্থিত এই পুস্তক-অর্ঘ্যখানি বাস্তবিক একটি জাদুঘরের সমতুল। যেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিনক্ষণ শুধু নয়, বঙ্গবন্ধুর আবেগ, আত্মত্যাগ ও অভিব্যক্তিসমূহও পাওয়া যায়। যা তাঁর রাজনীতি বা জীবন শুধু নয়, তাঁর দর্শন, তাঁর স্বপ্ন ও সংকল্পকেও ফুটিয়ে তোলে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত, ঘটনার এই সংকলন ইতিহাস উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বঙ্গবন্ধুকে আরো গভীরভাবে জানার আগ্রহ তো মেটাবেই, সেই সঙ্গে তাঁর ওপর বিদ্যাচর্চা, গবেষণার উৎস হিসেবে কাজ করবে এটি।

তাই বইটি নিয়ে যথার্থ মূল্যায়নই করেছেন বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের কিউরেটর। এর ফ্ল্যাপে তিনি লিখেছেন, "নতুন নতুন গবেষণা ও আবিষ্কারের সুযোগ থাকলেও বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এর চেয়ে চমৎকার প্রকাশনা আর কী হতে পারে"। ■

লেখক: গবেষক ও সাংবাদিক

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

শিক্ষালোক

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১ ● ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

সূচি

পঞ্চাশ বছরে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি - আশরাফ আহমেদ	২
৭ই মার্চের ভাষণ : একটি ধারাবাহিক প্রেক্ষাপট - রঞ্জন মল্লিক	৮
শেখ রাসেল : এক না-ফোটা ফুলের কলি - মনজুর শামস	১২
পিছনে ফিরে দেখা : আমাদের নারীসমাজ - শাহজাহান ভুঁইয়া	১৬
দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল - সালেহা বেগম	১৮
শিক্ষায় অগ্রগতি - দেওয়ান মামুনূর রশিদ	২০
আমাদের বিজ্ঞানচর্চা - আনোয়ারুল আজিম খান অঞ্জন	২২
শেখ রাসেল দিবসে আলোচনা	২৪
'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক রচনা-গল্প-কবিতা প্রতিযোগিতা	২৭
সিদীপে বিজয়োৎসব-২০২১	২৮
পঞ্চাশের বাংলাদেশ: বিশ্বের এক বিস্ময় - অলোক আচার্য	৩২
শহীদ বুদ্ধিজীবী দীনেশ চন্দ্র রায় মৌলিক- দীপ কুমার রায় মৌলিক	৩৪
শহীদ বুদ্ধিজীবী মোস্তাফা হাসান আহমেদ - শিশির মল্লিক	৩৬
'উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া' বইয়ের ওপর আলোচনা	৩৮
'আমাদের শিক্ষা : নানা চোখে' গ্রন্থের ওপর রচনা প্রতিযোগিতা	৩৯
মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার ৭১তম জন্মবার্ষিকী	৪০
সেরা করদাতা হিসেবে সিদীপের সম্মাননা লাভ	৪১
সিদীপের গবেষণাপত্র উপস্থাপন	৪১
সিদীপের ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা	৪২
বিজ্ঞানি জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে আলোচনা	৪৫
নাটক 'আমারে আপন করে লও' - মো. তারেকুজ্জামান	৪৮
সেলিম আল দীনের নাটক 'প্রাচ্য' - আলমগীর খান	৫১
শিল্পী অঞ্জনার 'অন্তশৈলী' - নাজনীন সাথী	৫৬
সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে - মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক	

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

প্রচ্ছদের ছবি
আলোর পথের যাত্রী
শিল্পী মাহিন মাহানুমা পালোমা

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি ⊕ irc.com.bd

সম্পাদকীয়

এ বছর বাঙালির স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা যে বিজয় অর্জন করেছি, ২০২১এ তারই সুবর্ণজয়ন্তী। মুজিব শতবর্ষে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উদযাপন করেছে গৌরবের সাথে। আমাদের সংস্থা সিদীপ ও শিক্ষালোকও এই উদযাপনে অংশ নিয়ে আনন্দিত ও গর্বিত। তাই এবারকার শিক্ষালোকের এই বিশেষ আয়োজন।

এ সংখ্যায় আছে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে আলোচনা, নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার শিশু শেখ রাসেলের কথা, মুক্তিযুদ্ধের সময়কার প্রসঙ্গ, দুজন শহীদ বুদ্ধিজীবীর কথা, পঞ্চাশ বছরে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির একটা খসড়া হিসাব, পুরুষবেশী দুঃসাহসী নারী মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিলের কথা এবং নাটকে ও চিত্রকলায় আমাদের কালের প্রতিফলন। সেইসঙ্গে মুজিব শতবর্ষে ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সিদীপের বিভিন্ন আয়োজনের কথা। নানা বিষয় নিয়ে চলতি শিক্ষালোক হয়ে উঠেছে আমাদের অনন্য বিজয়োৎসবের অংশ।

তবে আমাদর দেশকে এগিয়ে নিতে হবে আরও বহুদূর। একটি বেসরকারি উন্নয়নসংস্থা হিসেবে আমরা এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর। এ সুবর্ণজয়ন্তী বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আমাদের সকলকে আরও নিষ্ঠাবান, মানবিক, উদ্ভাবনীমূলক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে তুলুক–এই কামনা রইলো।

ফজলুল বারি

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ

পঞ্চাশ বছরে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি

আশরাফ আহমেদ

বাংলা নামের ভূখণ্ডে মানুষের অস্তিত্ব কয়েক সহস্র বছরের পুরনো। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ ও জাতি হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে আমারই জীবদ্দশায়, আমারই অংশগ্রহণে। আমাদের স্বাধীনতা ছিল অজস্র প্রাণের বিনিময়ে সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করে ছিনিয়ে আনার স্বাধীনতা।

এর আগে মধ্যযুগের সুলতানি আমলে এই ভূখণ্ডে যে কয়জন স্বাধীন শাসকের কথা আমরা জানি, জাতিগতভাবে তাঁরা সবাই ছিলেন বহিরাগত। সেই স্বাধীনতা ছিল তাঁদের স্বার্থে। তাঁদের ও তাঁদের শাসনের ভাষাও ছিল বিদেশি। তাঁদের স্বাধীনতা লাভ ও রক্ষা হতো ভাড়াটে সৈন্য দ্বারা।

কিন্তু একাত্তরে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করলাম তা ছিল বাংলায় জন্ম নিয়ে, বাংলায় কথা বলে, বাংলায় আজীবন সংগ্রাম করে বেড়ে ওঠা শেখ মুজিবর রহমান নামে এক অকৃত্রিম ও খাটি বাঙ্গালি নেতার আহ্বানে। তাই তাঁকে আমরা বঙ্গবন্ধু বলে জানি এবং বাঙালি জাতির পিতা বলে মানি। আর সেই স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত হলো বাঙালির স্বার্থে এবং বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী দ্বারা।

কাজেই বাঙালি হিসেবে এই স্বাধীনতার সাথে আমার সম্পর্ক আত্মার। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে?

১৯৭৮ সালে যখন প্রথম দেশ থেকে বেরোই তখন আমার বুকে ছিল যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করে নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সার্বভৌম দেশের এক নাগরিকের পরিচয়ের অসীম গর্ব। নির্ভিক চিত্তে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়িয়েছি সর্বত্র। কিন্তু বিদেশি ভাষা যখন কিছুটা বুঝতে শিখেছি দেখলাম বিদেশের সংবাদ মাধ্যমে বাংলাদেশ নামটি উচ্চারণ করা হতো ঘৃণা, তাচ্ছিল্য এবং করুণার সাথে। সে সবে তুলে ধরা হতো ক্রমান্বয়ে নিম্নগতির আর্থ-সামাজিক দৈন্যতা ও অব্যবস্থাপনার করুণ চিত্র। বিদেশিরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রথম পরিচয়ে আগ্রহ দেখালেও আমি বাংলাদেশের লোক জানতে পারলে তাদের চেহারা আগুনে পনি ঢালার মতো চুপসে যেতো। সেই কারণে পরবর্তী প্রায় পঁচিশটি বছর বিদেশিদের কাছে নিজেকে বাংলাদেশি পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেছি পদে পদে। বিদেশে বসবাসকারী অধিকাংশ বাঙালির মতোই হীনমন্যতায় ভুগেছি অবিরত।

ধীরে ধীরে একসময় লক্ষ করলাম যতোটুকু বলা হয় এবং নিজেরাও যা মনে করি, আমরা হয়তো ততোটা দেউলিয়া নই, নৈরাশ্যের বদলে আলোর আভাস যেন আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। এই উপলব্ধি থেকেই বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে 'আমরা কতো গরীব' নামে গবেষণাধর্মী একটি প্রতিবেদন লিখলাম ২০১২ সালে। ভয় ছিল, অনেক বাস্তবতা অস্বীকারকারী রাজনৈতিক-অর্থনীতিবিদের কাছেই লেখাটি প্রচণ্ড সমালোচনার শিকার হবে। কিন্তু হাতেগোনা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রকাশিত হবার সাথে সাথে দেশে এবং বিদেশে বসবাসকারী বাঙ্গালি পাঠকদের থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেলাম। কারণ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে নিরপেক্ষ কোনো অভিমত এর আগে এতো স্পষ্টভাবে কেউ উচ্চারণ করেননি।

সেই লেখাটির পর আরো নয়টি বছর পেরিয়ে গেছে। দেশটিও এগিয়ে গেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। বিদেশে বাংলাদেশকে কেউ আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না। বরং এককালে কিসিঞ্জারের 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র দেশটি

'বাংলাদেশ', 'বঙ্গবন্ধু', ও 'স্বাধীনতা' এই তিনটি শব্দের ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন। একাত্তরের আগে ও পরে একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্বও অকল্পনীয় ছিল। আমার আলোচনায় তাই এই তিনটি শব্দ একই অর্থে অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীভাবে উন্নত বিশ্বের কাতারে উঠে আসছে তার উদাহরণ টানা হয় প্রায় প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে। তেতাল্লিশ বছর আগে যুদ্ধজয়ী দেশের নাগরিক হিসেবে বিদেশে যেভাবে বুক উঁচিয়ে চলার মনোভাব ছিল, আজ আমার সেই গৌরব ফিরে এসেছে। কাজেই স্বাধীনতার পরবর্তী এই পঞ্চাশ বছরে আমার প্রাপ্তি অসীম!

পঞ্চাশ বছর আগে যে স্বাধীনতার সাথে বাঙ্গালির ছিল অস্তিত্বের সম্পর্ক, আজ তা রূপান্তরিত হয়েছে গর্ব ও গৌরবের সম্পর্কে। একে আপনি ভাবাবেগতাড়িত বলুন, অথবা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আপোশহীন আনুগত্য বলুন, আমি মনে করি গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণের প্রাপ্তি অনেক।

'বাংলাদেশ', 'বঙ্গবন্ধু', ও 'স্বাধীনতা' এই তিনটি শব্দের ব্যাবহারিক অর্থ অভিন্ন। একাত্তরের আগে ও পরে একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্বও অকল্পনীয় ছিল। আমার আলোচনায় তাই এই তিনটি শব্দ একই অর্থে অনেকবার ব্যাবহৃত হয়েছে।

যুদ্ধশেষে একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরে বিজয়লাভের সময় বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে অচল, সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ছিল শুন্য, ভারতে আশ্রয় নেয়া এক কোটি শরণার্থীসহ পুরো দেশটিই ছিল লণ্ডভণ্ড। সরকারি-বেসরকারি অবকাঠামো পর্যুদস্ত, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে শিল্পকারখানাগুলো উৎপাদনহীন, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী ছিল অসংগঠিত। সমস্যা হিসাবে এর সাথে যোগ হয়েছিল লুকিয়ে থাকা অস্ত্রধারী আলবদর-রাজাকার ও স্বাধীনতার শত্রুদের উপস্থিতি, এবং লক্ষাধিক ভারতীয় সহায়ক সৈন্যের উপস্থিতি। পরাজয়ের মুখে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের জলসীমায় পাকিস্তানিরা অসংখ্য মাইন পুতে রেখেছিল। ফলে বিদেশ থেকে খাদ্য ও পণ্যসাহায্যবাহী জাহাজ আসতে পারছিল না।

> পঞ্চাশ বছর আগে বিদেশ থেকে আমদানি করেও বাংলাদেশের সবার পেটে দুই বেলা খাবার জুটতো না। সেই পাকিস্তান আমল থেকেই বঙ্গবন্ধুর অনেক বক্তৃতার মূল কথা ছিলো: 'আমি চাই আমার দেশবাসী দুইবেলা পেটপুরে খেতে পাক'

কিন্তু পাকিস্তানের কারামুক্ত হয়ে বাহাত্তরের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরেই অনেকটা অবিশ্বাস্য রকমের স্বল্পতম সময়ের মাঝে বঙ্গবন্ধু পাহাড়সম এইসব সমস্যার সমাধান করলেন। তাঁর সমস্যা ও সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে এই লেখা কোনোদিনই ফুরোবে না। তাই স্বাধীনতার গুটিকয় প্রাপ্তি ও অর্জন মাত্র তুলে ধরছি।

একাত্তরের যুদ্ধের সময়ে ও পরে দেশি-বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল ভারতীয় বাহিনী কখনোই বাংলাদেশ ছেড়ে যাবে না এবং স্বাধীনতা লাভ করলেও দারিদ্র্যে জর্জরিত দেশটি হবে স্বল্পায়ু। সেইসব অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু বিজয়ের মাত্র তিন মাসের মাথায় লক্ষাধিক ভারতীয় সৈন্যকে শুধু ফেরতই পাঠালেন না, দেশটিকে সসম্মানে বেঁচে থাকার ভবিষ্যতও নিশ্চিত করলেন।

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়েছিল স্বাধীনতার নয় বছর পর, যা কখনোই কার্যে রূপান্তরিত হতে পারেনি। ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল স্বাধীনতার আড়াই বছর পর। গণচীনেরটি প্রণীত ও গৃহীত হয়েছিল তিন বছর পর। সেই তুলনায় আইন মান্য করে দেশ শাসন করতে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতার মাত্র এগারো মাস পর। এটি আমাদের অনন্য সাধারণ একটি উদাহরণ ও প্রাপ্তি! সম্ভব হয়েছিল আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বঙ্গবন্ধুর একাগ্রতার জন্য।

পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা অবাঙালিকে ফিরিয়ে নিতে পাকিস্তান অস্বীকার করলো। অপর দিকে স্বাধীনতার মাত্র তিন বছরের মাথায় পাকিস্তানে আটকে পড়া এক লক্ষ ষাট হাজার (সংখ্যাটি ১.৬ থেকে ৫ লক্ষ বলে বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করেছে) সামরিক ও বেসামরিক বাঙালি চাকুরিজীবী ও পরিবারের সদস্যকে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরিয়ে আনলেন। শুধু তাই নয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি কাঁধে নিয়েও তিনি এদের সবাইকে উপযুক্ত চাকুরিতে নিয়োগ-বহাল করলেন।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর মাত্র তিন বছর আট মাস বেঁচেছিলেন। দেশে চলছিল যুদ্ধে পরাজিত শত্রু এবং রাতারাতি সমাজতন্ত্র কায়েমে অত্যুৎসাহী যুবকদের সম্মিলিত ধ্বংসাত্মক কাজ। এদের সামাল দিয়ে এই অল্প সময়ের মাঝে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও প্রায় নিঃস্ব দেশটির জন্য তিনি যা করতে পেরেছিলেন তা ছিল অসামান্য অর্জন।

পঞ্চাশ বছর আগে বিদেশ থেকে আমদানি করেও বাংলাদেশের সবার পেটে দুই বেলা খাবার জুটতো না। সেই পাকিস্তান আমল থেকেই বঙ্গবন্ধুর অনেক বক্তৃতার মূল কথা ছিলো: 'আমি চাই আমার দেশবাসী দুইবেলা পেটপুরে খেতে পাক।' মধ্যপ্রাচ্যে তেল জাতীয়করণে সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, অসাধু ব্যাবসায়ীদের কারসাজি এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ফলে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষকে মোকাবেলা করতে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রতিটি অনাবাদী জমি চাষ করতে। সুফলটি তিনি দেখে যেতে পারেননি। সুফল ও প্রশংসাটি কুড়িয়েছিলেন তাঁকে হত্যা করে বসা পরবর্তী শাসকগণ। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য কন্যা ১৯৯৬ সালে এবং ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসেই বিশ্বব্যাংক এবং দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শকে অগ্রাহ্য করলেন। কৃষিঋণ বাড়ানো এবং কৃষিকাজে ভর্তুকি দিয়ে সারের দাম এক পঞ্চমাংশের নিচে নামিয়ে কৃষি উৎপাদনকে উৎসাহিত করলেন। ফলে বাংলাদেশে আজ কেউ অভুক্ত নেই। ধান-চাউল উৎপাদনের পাশাপাশি দুধ, সব্জি, মাছ-মাংস এবং অন্যান্য পুষ্টিসমৃদ্ধ ফলের ফলন বেড়েছে। দুইবেলা আহারের ব্যবস্থা করার বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছাটি পূরণ হয়ে মানুষ এখন তিন-চারবেলা পেটপুরে খেতে পারছে। একজন দিনমজুরের একদিনের আয়েই তা সম্ভব হচ্ছে। অধিক খাবার ফলে 'মোটা হয়ে যাওয়া' বা ওবেসিটির মত উন্নত বিশ্বের সমস্যাটি এখন বাংলাদেশে বাসা বাঁধছে। ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ঢাকার কোনো সিনেমায় নায়ক-নায়িকা ও

অভিনেতার চেহারা ও স্বাস্থ্য দেখলে আজ তাঁদের পুষ্টিহীন ও অনাহারক্লিষ্ট মনে হয়।

পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম শ্রেণি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সবাইকে বেতন দিয়ে এবং বই কিনে পড়াশোনা করতে হতো। সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশই শিক্ষার এই ব্যয় বহন করতে পারতো। আর যারা পারতো, সব বই কেনার সামর্থ্য তাদেরও অনেকের থাকতো না। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়ার সময়ও সব পাঠ্যবই আমার ছিল না, বন্ধুদের থেকে ধার নিয়ে পড়েছি। আজ বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু সরকারি খরচে স্কুলে যাচ্ছে। এর সাথে যোগ হয়েছে সবচেয়ে আশ্চর্য ও প্রশংসনীয় একটি কাজ। সরকার প্রতিটি ছাত্রের জন্য প্রতিটি পাঠ্যবই বিনা মূল্যে পৌঁছে দিচ্ছে স্কুলগুলোতে শিক্ষা-বছরের প্রথম দিনটিতে। এ বছর সেই বইয়ের সংখ্যা ছিল চৌত্রিশ কোটি! পৃথিবীর আর কতোটি দেশ এই দূরদর্শিতা ও পারদর্শিতা দেখাচ্ছে তা আমার জানা নেই। কিন্তু খোদ আমেরিকার সব স্কুলেই সব বই সময়মতো পৌঁছায় না তা জানি। ২০১৩ সালে একসাথে ৬ সহস্রাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সোয়ালক্ষ শিক্ষকের চাকুরিকে সরকারিকরণ দ্বারা শিক্ষাকে আরো সার্বজনীন করা হয়েছে। ১৯৭০ সালে ২৫% এবং ২০০৭ সালে ৪৭%এর তুলনায় বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী আজ ৭৫% শিক্ষিত। আজ শতকরা ৯৮ ভাগ শিশু প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করছে। এর চেয়ে আরো বেশি অর্জন হলো আজ মাধ্যমিক স্কুলে ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশি! শিক্ষিত এই মেয়েরাই বাংলাদেশের উন্নতির চাবিকাঠি হয়ে উদিত হয়েছে।

স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশের প্রায় ৯০% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতো। দারিদ্র্য কমতে কমতে আজ তা ১৭ শতাংশের নিচে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের আড়াই কোটি লোক, যা মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সফলতাকে সামনে এনে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করে ২০২১ সালের ১০ই মার্চ নিউইয়র্ক টাইমস-এ এক প্রতিবেদন লিখেছেন পুলিটজার পুরষ্কার-প্রাপ্ত সাংবাদিক নিকোলাস ক্রিস্টোফ।

আশির দশকে আমার জাপান অবস্থানকালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে জড়িত জন্মহারের উর্ধ্বগতির সমালোচনা করতে গিয়ে হাস্যোচ্ছলে ব্রাজিলের এক বন্ধু বলেছিল 'তোমাদের দেশে এতো অন্ধকার কেন? রাতে বাতি জ্বালিয়ে রাখতে পার না?' তখন উত্তর কি দিয়েছিলাম মনে নেই, তবে আমার জীবদ্দশায় গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে তেমন কল্পনা করা ছিল নিতান্ত বোকার কাজ। একাত্তরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ১.৮ হাজার মেগাওয়াট। স্বাধীনতার পর দুই যুগ ধরে শ্লথ গতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কিছুটা বেড়ে ১৯৯৫ সাল নাগাদ ২ হাজার মেগাওয়াটের সক্ষমতা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার ভোক্তা ছিল মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ মাত্র! আমরা লক্ষ করলাম ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসেই শেখ হাসিনা সরকার জাপানের সহায়তায় পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের বিদ্যুতের চাহিদার পরিমাণ নির্ণয় করে দ্রুততম সময়ে তা সমাধানে নেমে পড়লো। সরকারি প্রণোদনায় এই দ্রুততার উদাহরণ টেনে রয়টারের সংবাদ অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বে 'সূর্যরশ্মি-জাতি' বা ' 'সোলার ন্যাশন' হয়ে যাওয়ার কথা আজ থেকে ছয় বছর আগেই। এর বাইরে 'কুইক রেন্টাল' নামে বেশ কয়টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প শুরু হবার সাথে সাথে বিরোধীদলের অর্থের অপচয় অভিযোগকে আমলে না নিয়ে সরকার স্বীয় উদ্দেশ্যে অটল থাকলো। ফলে আজ একুশ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদনের সক্ষমতা নিয়ে বাংলাদেশ গ্রামে তো বটেই, জনসংখ্যার ৯৯ ভাগকে বিদ্যুৎ শক্তির সুফল পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে কৃষি, সেচ, শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যে উৎপাদন বাড়িয়ে শুধু দারিদ্র্য দূরীকরণই হচ্ছে না, অন্ধকারকে বিদায় জানিয়ে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে এনে জাতিকে আলোর পথে তা পরিচালিত করছে।

দারিদ্র্য কমতে কমতে আজ তা ১৭ শতাংশের নিচে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের আড়াই কোটি লোক, যা মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছে

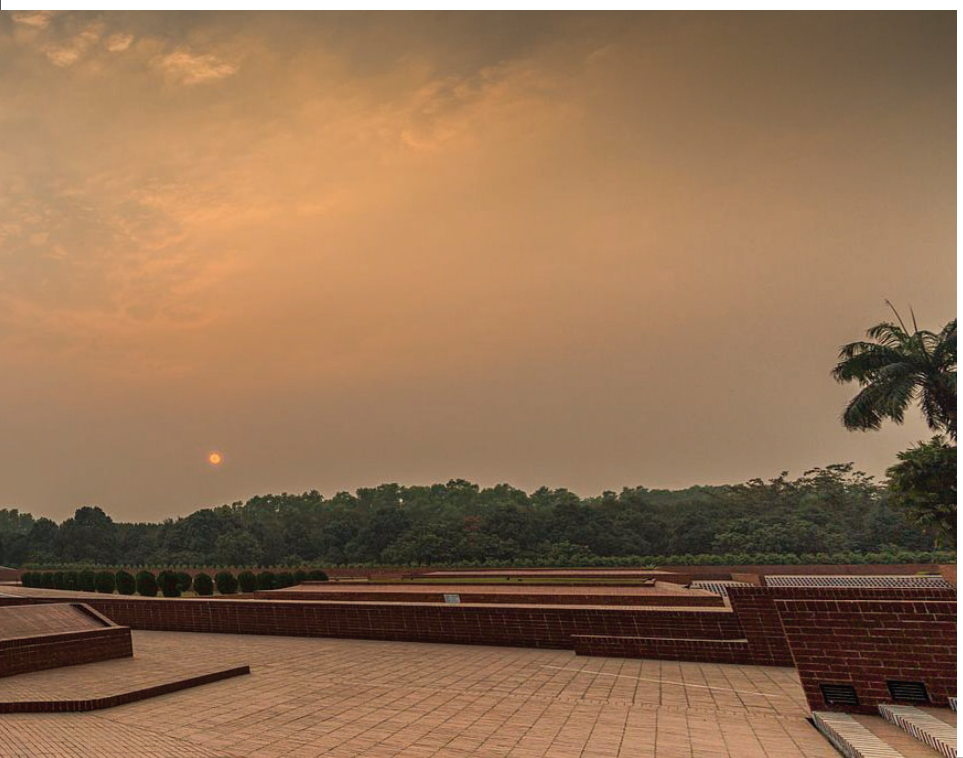

অপ্রাপ্তির খাতায় অন্যান্য দিকও আছে। তবে একসময় নৈরাশ্যবাদে ভুগলেও এখন আমি আশাবাদী। অর্ধেক খালি গ্লাশটি আমার চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে অর্ধেক ভরা গ্লাশটি। মনে রাখা দরকার, পাকিস্তানি বৈমাত্রেয় শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পেতে আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম স্বাধীনতা পেলেই দুধের পেয়ালাটি আপনিতেই আমার মুখে চলে আসবে, আমরা পরম সুখে দিন কাটাবো। আমরা কল্পনাও করতে পারলাম না যে জাতি গঠনের কাজ স্বাধীনতা যুদ্ধের চেয়ে কম কঠিন নয়

অনুন্নত দেশের স্বাস্থ্যসেবায় বাংলাদেশের সাফল্য আমেরিকার স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থাগুলো উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরে। ২০১৪ সালে বিখ্যাত সাইন্টিফিক আমেরিকান ম্যাগাজিনের বিশেষ একটি সংখ্যার পুরো দুটো নিবন্ধই লেখা হয়েছে বাংলাদেশের প্রশংসা করে। প্রয়োজনীয় ওষুধের ৯৭ ভাগ দেশেই প্রস্তুত ও স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করে বলেও তাতে স্বীকার করা হয়। গ্রামে ও ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও লোকজন স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে। ১৯৭১ সালে আমাদের গড় আয়ু ৪৭ বৎসর থেকে বেড়ে এখন ৭২ বছরে দাঁড়িয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো রাজ্যের গড় আয়ু থেকেও বেশি! তথ্যটি আমার নয়, নিউইয়র্ক টাইমসের এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সরকারি প্রকল্পটি কয়েকটি তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী সুফল বয়ে আনছে। দৃশ্যমান সবচেয়ে বড় সুফলটি হচ্ছে প্রতিমাসে কোনো ঘুষ প্রদান এবং সময় ব্যয় না করেই বৈদ্যুতিক, পানি, টেলিফোন ও গ্যাসের বিল পরিশোধ করতে পারা। দ্বিতীয় সুফলটি হচ্ছে ছিনতাই হয়ে যাওয়া ঠেকিয়ে প্রতিমাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে দেশের সব শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারিদের বেতন ঠিক ঠিক ব্যাংক-হিসাবে পৌঁছে যাওয়া। এভাবে রোধ হয়েছে টেন্ডারবাজিতে নিয়মিত হত্যাকাণ্ড, বিদেশে চাকুরিপ্রার্থীদের ভোগান্তি এবং ব্যাবসা ও ব্যক্তিগত টাকাপয়সা লেনদেনের ঝামেলা। সুদূরপ্রসারী লাভ হচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করেও আমাদের যুবসমাজ পৃথিবীর যে কোনো দেশে শিক্ষালাভ করতে পারছে, নিত্যনতুন ব্যবসা খুলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছে এবং প্রতিযোগিতামূলক চাকুরিও খুঁজতে পারছে। সর্বশেষ উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধনী-দরিদ্র ও প্রভাবশালী-নিরীহ বিবেচনায় না নিয়ে যে কোনো সামাজিক অবস্থানের লোকই 'আগে আসিলে আগে পাইবেন' নীতিতে করোনার টিকা নিতে পারছেন। ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতাধীন অন্তর্জাল বা ইন্টারনেট প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে যে কতো দ্রুতগতিতে বদলে দেবে তা আমাদের অনুমানেরও বাইরে। কাজেই আগেভাগেই দেশের জনগণের মাঝে এই প্রযুক্তিটি সুলভ করে দিয়ে সরকার তার দূরদৃষ্টিরই পরিচয় দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের পরিচয় আর মেরুদণ্ডহীন বা 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নয়। নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় শেষ হতে যাওয়া বিশাল পদ্মাসেতু নির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য বাংলাদেশ একটি অনন্য উদাহরণ হয়েছে। মিয়ানমার থেকে আগত ১১ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে বাংলাদেশ বিশ্বে মানবতাবাদী দেশ হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছে। সর্বোপরি জাতিসঙ্ঘের বিবেচনায় দেশটি এখন আর হতদরিদ্র বা স্বল্পোন্নত নয়, আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছি।

এইরকম আরো অসংখ্য বিবেচনায় দেশটিকে কোনমতেই আর পঞ্চাশ বছর আগেকার আমার দেখা বাংলাদেশের ফ্রেমে বসাতে পারি না। বিগত এক যুগ থেকে যে দুর্বার গতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

পঞ্চাশ বছরে আমাদের অপ্রাপ্তির সংখ্যা কম হলেও গুরুত্ব কম নয়। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আন্দোলনে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক প্রাণহানিকে সূতিকাগার মেনে নিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পঞ্চাশটি বছর পেরিয়ে গেছে। স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এবং সরকারি অপিস-আদালতে বাংলা প্রচলনের কাজ শুরু হয়েছিল। আমাদের সংবিধানটিও প্রণীত হয়েছিল বাংলায়। কিন্তু দেশে আজ বাংলা ভাষার দৈন্যতা দেখলে প্রাণে বড় ব্যথা পাই।

এখনো ইংরেজি, উর্দু বা হিন্দিতে উদ্ধৃতি ছাড়া শুদ্ধ বাঙলায় আমরা কথা বলতে পারি না বা চাই না! খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই শুধুমাত্র বাংলাভাষীদের উপস্থিতিতে আয়োজিত সেমিনার ইংরেজিতে পরিচালিত হয়! এখনো কোর্টকাছারিতে দাপ্তরিক প্রতিবেদন লেখা হয় ইংরেজিতে! উচ্চশিক্ষায় এখনো বাঙলায় পাঠ্যবই রচনা এবং বাঙলায় শিক্ষাদান চালু করতে পারিনি!

বিগত পঞ্চাশ বছরে আমাদের আরেকটি অপ্রাপ্তি হচ্ছে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেয়া। দেশটির জন্মই হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার স্লোগান মাথায় রেখে। প্রায় এক হাজার বছর ধরে এই ভূখণ্ডে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও মুসলমানরা একই শাসনাধীন পাশাপাশি বসবাস করে আসছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে একুশ বছরের জন্য এর ছেদ পড়েছিল। দীর্ঘ কুড়ি বছর পাকিস্তানি শাসনে থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র বাঙালির কোনো কল্যাণ বয়ে আনেনি, ধর্মের দোহাই দিয়ে বরং আমরা শোষণ ও বঞ্চনারই শিকার হয়েছিলাম। তাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিলো

বিগত পঞ্চাশ বছরে আমাদের আরেকটি অপ্রাপ্তি হচ্ছে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেয়া। দেশটির জন্মই হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার স্লোগান মাথায় রেখে। প্রায় এক হাজার বছর ধরে এই ভূখণ্ডে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও মুসলমানরা একই শাসনাধীন পাশাপাশি বসবাস করে আসছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে একুশ বছরের জন্য এর ছেদ পড়েছিল। দীর্ঘ কুড়ি বছর পাকিস্তানি শাসনে থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র বাঙালির কোনো কল্যাণ বয়ে আনেনি, ধর্মের দোহাই দিয়ে বরং আমরা শোষণ ও বঞ্চনারই শিকার হয়েছিলাম। তাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিলো।

অপ্রাপ্তির খাতায় অন্যান্য দিকও আছে। তবে একসময় নৈরাশ্যবাদে ভুগলেও এখন আমি আশাবাদী। অর্ধেক খালি গ্লাশটি আমার চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে অর্ধেক ভরা গ্লাশটি। মনে রাখা দরকার, পাকিস্তানি বৈমাত্রেয় শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পেতে আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম স্বাধীনতা পেলেই দুধের পেয়ালাটি আপনিতেই আমার মুখে চলে আসবে, আমরা পরম সুখে দিন কাটাবো। আমরা কল্পনাও করতে পারলাম না যে জাতি গঠনের কাজ স্বাধীনতা যুদ্ধের চেয়ে কম কঠিন নয়। বর্তমানে স্বাধীনতায় নেতৃত্বদানকারী, স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং স্বাধীনতায় বিশ্বাসী দলটি বাংলাদেশের নেতৃত্বে। বিশ্ববাসীর সাথে আমিও অবাক বিস্ময়ে দারিদ্র্যকে পিছু ফেলে দেশটির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করছি। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ যে আরও এগিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখতেন তা এখন আর সুদূরে নয়। ■

লেখক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিজ্ঞানী ও লেখক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক। মুক্তিযুদ্ধ, বিজ্ঞান বিষয়ক রম্য রচনা, সমাজ ও ভ্রমণ-নির্ভর বেশ ক'টি গল্পের বই ও উপন্যাস লিখেছেন।

৭ই মার্চের ভাষণ

একটি ধারাবাহিক প্রেক্ষাপট

রঞ্জন মল্লিক

পাকিস্তানের স্রষ্টা ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। কিন্তু জনগণ তার ছায়াও মাড়াতেন না। লিয়াকত আলী খান, নূরুল আমীন, খাজা নাজিমুদ্দীন, ইস্কান্দার মির্জা এরা সবাই ছিল প্রাসাদ রাজনীতির ভক্ত, জনসাধারণের মধ্যে তাদের কোন আবেদন ছিল না। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে প্রতিনিয়তই মাঠে নামেন আর বন্দী হন। তিনি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত নেতা হয়েও ১৯৫৬ সালের ৪ আগস্ট ভুখা মিছিলের নেতৃত্ব দিতে মাঠে নামলেন। ঐ বছরের ৬ ডিসেম্বর আতাউর রহমান খানের শিল্প, বাণিজ্য ও দুর্নীতিদমন মন্ত্রী হন তিনি। শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতি করেছেন অতি সাধারণ মানুষের। যা পাকিস্তানের কোন মুসলিম লীগ নেতার আদর্শে ছিল না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঊনসত্তর-সত্তর সালে এসে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠেননি, ১৯৫৬ সাল থেকেই পার্লামেন্টে প্রতিবাদী জোরালো কণ্ঠস্বর ও পাকিস্তানি ভূ-স্বামী শাসকদের যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠেন। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতির পদ গ্রহণ করেই তিনি পূর্ব বাংলাকে শোষণ-শাসনের জাঁতাকল থেকে রক্ষা করার জন্য ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এই ছয় দফা দাবির মূল ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা। তিনি পাকিস্তানের লাহোরে সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব বাংলার ৬ দফা দাবি পেশ করেন।

পাকিস্তান সামরিক শাসক শেখ মুজিবের ৬ দফা দাবিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি হিসেবে উল্লেখ করে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতাদের উপর দমন-পীড়ন চালায়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে তাকে সহ ৩৫ জনকে জেল হাজতে পুরে। বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামী। এ সময় দেশে প্রবল উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। সমগ্র পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে এসে দাঁড়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা দুর্বার আন্দোলন শুরু করে। ফলে ছাত্রজনতা এক হয়ে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে গণ-আন্দোলন শুরু করে। এতে ছাত্রনেতা আসাদ, নবকুমার স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমানসহ সারা দেশে অসংখ্য মানুষ আত্মাহুতি দেয়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সব সময় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাকে পাকিস্তানি সরকারের কাছে নতজানু না হবার পরামর্শ দিতেন।

বঙ্গমাতাও দেশের মানুষের হৃদয় বুঝতেন। তাই তিনি শেখ মুজিবকে আপোশের বিরুদ্ধে দৃঢ় হতে বলেছিলেন। তিনি পাকিস্তানি সামরিক শাসকের সাজানো গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে তাকে নিষেধ করেন। বঙ্গমাতার নির্দেশ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

সেদিনের ছাত্রজনতার উত্তাল দাবির মুখে পাকিস্তানি সামরিক শাসক ৬৯এর ২২ মার্চ তাকে নিশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি হন বঙ্গবন্ধু। রেসকোর্স ময়দানে দশলাখ লোকের সমাবেশে ছাত্রজনতা তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে অভিষিক্ত করেন।

সত্তরের নির্বাচনোত্তর বেশ কিছু ভাষণে আমরা দেখতে পাই বঙ্গবন্ধু এদেশের জনগণকে সম্ভাব্য এক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলছেন। ৩০ অক্টোবর ১৯৭০ জয়দেবপুরের জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ৬ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চায়। বাংলার মানুষের কল্যাণ এবং মুক্তির জন্যে এটা আমাদের শেষ সংগ্রাম। যদি নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয় তবে গণ-আন্দোলনের পরিকল্পনা আছে। মূলত সত্তরের নির্বাচনী প্রচারণার সময় থেকেই জনগণকে চূড়ান্ত মুক্তিসংগ্রামের ইঙ্গিত দিতে থাকেন তিনি। সাধারণ নির্বাচন প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুর রেডিও-টেলিভিশনের ভাষণটি (২৮ অক্টোবর ১৯৭০) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, সমাজে ক্যানসারের মতো যে দুর্নীতি

সেদিনের ছাত্রজনতার উত্তাল দাবির মুখে পাকিস্তানি সামরিক শাসক ৬৯এর ২২ মার্চ তাকে নিশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি হন বঙ্গবন্ধু। রেসকোর্স ময়দানে দশলাখ লোকের সমাবেশে ছাত্রজনতা তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে অভিষিক্ত করেন

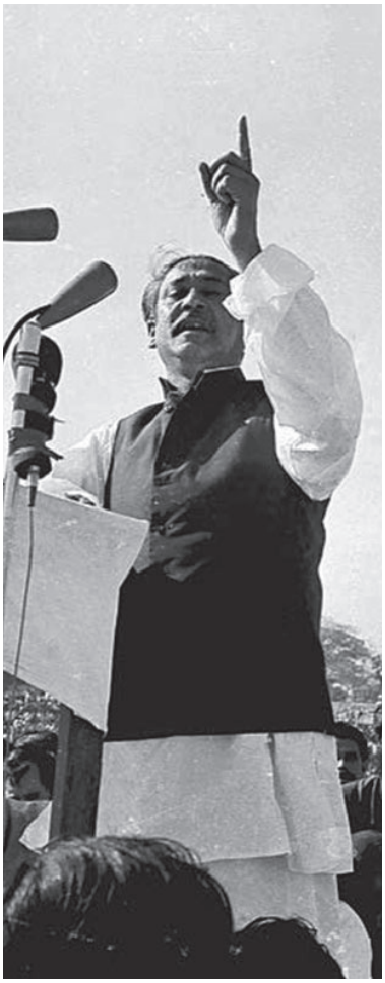

বিদ্যমান তাকে নির্মূল করতে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। ৯০ লক্ষ শ্রমিক বেকার। ২৩ বছরে সরকারি চাকুরিতে বাঙালির সংখ্যা ১৫ শতাংশ। দেশরক্ষা বাহিনীতে বাঙালির সংখ্যা দশ শতাংশের কম। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য ৫ থেকে ১০০ ভাগ বেশি। দেশের ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। ৬ দফার আলোকে ফেডারেলের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হবে। আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই, ক্ষমতার চেয়ে জনতার দাবি আদায়ের সংগ্রাম অনেক বড়।

নির্বাচনে জয় লাভের পর ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০ বঙ্গবন্ধু ভাষণে বলেন, উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লাখ লোক মারা গেছে এবং বর্তমানে এ অঞ্চলগুলোতে ৩০ লাখ লোক শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের জনসাধারণের এই অবস্থা আমাদের অতীতের শোষণ ও অবহেলার নিষ্ঠুরতাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আর সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাদের পাহাড়সমান কর্তব্যকে।

১১ ডিসেম্বর সন্দীপ হাই স্কুল মাঠে ভাষণে তিনি বলেন, রিলিফ কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, আইয়ুব খানের দিন শেষ হয়ে গেছে, আমরা প্রতিটি পয়সার হিসাব নেব।

১৪ ডিসেম্বর তিনি ইয়াহিয়া খানকে তারবার্তা প্রেরণ করেন, একমাত্র ৬-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতন্ত্রই অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনোত্তর ও নির্বাচন-পরবর্তী ভাষণগুলো পাঠ করলে সেই সময়কার উত্তপ্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে কোন প্রকার ছাড় দেওয়া বা আপোশরফায় রাজি নন এই বিষয়টি তিনি পাকিস্তান সামরিক সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে পরিষ্কার করেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১এ তেজগাঁও অঞ্চলে দেয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, ৬ দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে। ৬ দফা কর্মসূচি শুধু বাংলার মানুষের জন্য নয়। আমরা সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশকেও বাংলাদেশের সমপরিমাণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়ার পক্ষপাতী। থাকবে না মানুষে মানুষে শোষণ। পাকিস্তান আন্দোলন কেন করেছিলাম–এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি সেদিন বলেছিলেন, উন্নত জীবনের আশাতেই জনগণ সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছিল। কিন্তু সব জায়গায় তারা এমনভাবে শোষিত হয়েছে যে, তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙে গেছে। বাংলার মানুষের উদারতার সুযোগ নিয়ে সারা বাংলাদেশকে লুট করা হয়েছে। যাদের ৫ লাখ টাকা ছিল তারা এখন ৫ কোটি টাকার মালিক হয়েছে। এই টাকা আসমান থেকে আসেনি। পাকিস্তানের নামে দরিদ্র জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে এই পুঁজি সৃষ্টি হয়েছে। ২২ পরিবার টেলিফোনে কোটি কোটি টাকার এলসি খুলে ফেলে আর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা শতকরা ৪৫ টাকা জমা দিয়েও এলসি খোলার জন্য হয়রান হয়।

মূলত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সকল দলের সমন্বয়ে একটি সংবিধান রচনা করা ছিলো মূল কাজ। এই কাজ সমাধানের জন্য সময় ছিলো তিন মাস। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক শাসকগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা আর থাকছে না, এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় বাঙালির আধিপত্য ঘটবে - এই সহজ সত্যটি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মেনে নিতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধু বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। দেশে সংঘাত ঘটতে পারে–এই ধারণা নির্বাচনের সময় থেকেই জনগণের মনে গ্রথিত করতে পেরেছিলেন তিনি। তাই তিনি ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১এ তেজগাঁও অঞ্চলে দেয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, ৬ দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে। ৬ দফা কর্মসূচি শুধু বাংলার মানুষের জন্য নয়। আমরা সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশকেও বাংলাদেশের সমপরিমাণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়ার পক্ষপাতী

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের রাজনৈতিক তাৎপর্য: পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি শোষিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত। ১৯৪৬এর নির্বাচনে বাঙালিরা মুসলীম লীগকে ভোট না দিলে পাকিস্তান হতো কিনা সন্দেহ। অথচ ক্ষমতা হাতে আসার পর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা শুরু থেকেই বাংলাকে উপনিবেশ বানাতে উঠে পড়ে লেগে গেল, যা শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান আমলের শুরু থেকেই ক্ষুব্ধ করে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কখনোই গণতন্ত্রমনা ছিলো না। অবৈধ সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট হয় তারা। দলন, নিপীড়ন, শোষণ ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলা শাসন করা তাদের নীতিতে পরিণত হয়েছিলো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসব শোষণের প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে কোন ধরনের আপোশরফায় যাননি। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের রাজনৈতিক মুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে। তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিলো পাকিস্তান আমলের ২৩ বছরের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সরাসরি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির নির্যাস হচ্ছে তাঁর ভাষণের শেষ দুটি লাইন: এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

• *লেখক: সাংবাদিক*

শারমিন সুলতানার কবিতা

১. ভেবে ভেবে

কোন একদিন আমি হবো কবি
না হয় কাব্যকার
লিখবো না হয় কবিতা, না হয় ছন্দ, না হয় কোন কাব্য
ভেবে ভেবে সময় যাচ্ছে আমার
আজ লিখি, কাল লিখি অথবা পরশু
কিন্তু ভাবনা শেষ হয় না।
কী আসলে লিখবো আমি, কী আসলে জানি আমি
কবির শব্দ কী হবে, বা সাহিত্যের রসনা কী হয়।
অবশেষে বিষাদের আবাদই হয়েছে আমার
তাই আর কাব্য বা কবিতা
কোনটাই লেখা হয়ে ওঠেনি আমার।

২. আতিথেয়তা

তোমার আতিথেয়তায় রাখিনি আমি কোন কমতি।
ঠক ঠক দরজার শব্দ
শুরুতেই দিয়েছিলাম সালাম, মাথা নতসহ নম্রতায়।
বসিতে দিয়েছিলাম বিশাল এ আঙিনায়।
চেনা সুরে বলিলে আমায়–চিনি কতোটা?
একগাল হেসে বলিলাম আমি–
যতোটা পথ পাড়ি দিলে সুখের দেখা মেলে।
সেই কবে বলেছিলে–
আজও ঐ পথ পানে অপেক্ষায় রত আমি।
আর দেখা পাইবো না কি আমি!
তার মানে কি আমার আতিথেয়তায় ছিল কোন কমতি?

• *কবি: সহকারি কর্মকর্তা (ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস), সিদীপ*

শেখ রাসেল

এক না-ফোটা ফুলের কলি

মনজুর শামস

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছার পাঁচ সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট শেখ রাসেল। প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসিনার বড় আদরের অতি প্রিয় ছোট ভাই। ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে তার জন্ম। এ সময়টায় দূরদর্শী প্রজ্ঞায় রাজনৈতিক অঙ্গনে দারুণ ব্যস্ত বঙ্গবন্ধু তার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রেখেছিলেন প্রিয় লেখক ও দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের নাম অনুসারে, কারাগারেও তিনি যার বই পড়তেন। ছোট ভাই রাসেলের জন্মের দিনটির কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন, '১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর রাসেলের জন্ম হয় ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসায়, আমার শোয়ার ঘরে। দোতলা তখনও শেষ হয়নি। বলতে গেলে মা একখানা করে ঘর তৈরি করেছেন। একটু একটু করেই বাড়ির কাজ চলছে। নিচতলায় আমরা থাকি। উত্তর-পূর্ব দিকের ঘরটা আমার ও কামালের। সেই ঘরেই রাসেল জন্ম নিল রাত দেড়টায়।

... রাসেলের জন্মের আগের মুহূর্তগুলো ছিলো ভীষণ উৎকণ্ঠার। আমি, কামাল, জামাল, রেহানা ও খোকা চাচা বাসায়। বড় ফুফু ও মেঝ ফুফু মার সাথে। একজন ডাক্তার ও নার্সও এসেছেন। সময় যেন আর কাটে না! জামাল আর রেহানা কিছুক্ষণ ঘুমায় আবার জেগে ওঠে। আমরা ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে জেগে আছি নতুন অতিথির আগমন বার্তা শোনার অপেক্ষায়। মেঝ ফুফু ঘর থেকে বের হয়ে এসে খবর দিলেন আমাদের ভাই হয়েছে। খুশিতে আমরা আত্মহারা। কতক্ষণে দেখবো, ফুফু বললেন তিনি ডাকবেন। কিছুক্ষণ পর ডাক এলো। বড় ফুফু আমার কোলে তুলে দিলেন রাসেলকে। মাথাভরা ঘন কালোচুল। তুলতুলে নরম গাল। বেশ বড়সড় হয়েছিলো রাসেল।'

মৃত্যুর আগে সে ছিলো ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। মাত্র ১১ বছরের জীবনে বিশাল এক সম্ভাবনার আভাস রেখেছিলো। দানব ঘাতকের বুলেটের মুখে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে বলেছিলো, 'আমি মায়ের কাছে যাবো।' পরে মায়ের লাশ দেখার পর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে মিনতি করেছিলো, 'আমাকে হাসু আপার (শেখ হাসিনা) কাছে পাঠিয়ে দিন!' কিন্তু তার সেই মিনতিতে কান দেয়নি নরপশুরা, বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল শিশু রাসেলের কোমল দেহ। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত কর্মচারী এএফএম মহিতুল ইসলাম

মৃত্যুর আগে সে ছিলো ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। মাত্র ১১ বছরের জীবনে বিশাল এক সম্ভাবনার আভাস রেখেছিলো। দানব ঘাতকের বুলেটের মুখে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে বলেছিলো, 'আমি মায়ের কাছে যাবো'

বলেছেন, "রাসেল দৌড়ে এসে আমাকে জাপটে ধরে। আমাকে বলল, ভাইয়া, আমাকে মারবে না তো? ওর সে কণ্ঠ শুনে আমার চোখ ফেটে পানি এসেছিল। এক ঘাতক এসে আমাকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে ভীষণ মারল। আমাকে মারতে দেখে রাসেল আমাকে ছেড়ে দিল। ও কান্নাকাটি করছিল যে, 'আমি মায়ের কাছে যাব, আমি মায়ের কাছে যাব।' এক ঘাতক এসে ওকে বলল, 'চল তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসি।' বিশ্বাস করতে পারিনি যে ঘাতকরা এতো নির্মমভাবে ছোট্ট সে শিশুটাকেও হত্যা করবে। রাসেলকে ভিতরে নিয়ে গেল এবং তারপর ব্রাশ ফায়ার।"

এতটুকু জীবনে বলতে গেলে পৃথিবীর তেমন কিছুই তার দেখা হয়নি। অন্য দশজন শিশুর মতো তারও ছিল এক দুরন্ত শৈশব। হাসত, খেলত, গল্প করত, সাইকেলে মন উড়িয়ে ছুটে বেড়াত। বাবা থাকতেন দেশের কাজে ভীষণ ব্যস্ত। বজ্রকণ্ঠে জনসভায় ভাষণ, মিছিল–কখনো আবার রুদ্ধ থাকতেন জেলখানায়। তাই বাবাকে কাছে পেত খুবই কম। অন্য শিশুরা বাবার সাথে কত মজা করে! সেও করত, তবে অন্য শিশুদের মতো সারাক্ষণ বাবাকে এত কাছে পেত না। এজন্য সে মাঝে মাঝে মাকেই বাবা বলে ডাকত! বাবাকে কাছে না পেলে কী-ই-বা আর করার ছিল তার!

রাসেলের সব চেয়ে প্রিয় সঙ্গী ছিল তার হাসুপা (শেখ হাসিনা)। পুরোটা সময় কাটত তার হাসুপা'র সঙ্গে। রাসেল হাসুপা'র চুলের বেণি ধরে খেলতে পছন্দ করত। সে তার চুল ধরে নাড়ত আর ফিকফিক করে হাসত। সে হাঁটতেও শিখেছিল তার প্রিয় হাসুপা'র হাত ধরে, তাও আবার একদিনেই! আসলে রাসেল সবকিছুতেই একটু ব্যতিক্রম ছিলো, আর থাকবেই না কেন? তিনি যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র!

দিনের পর দিন কারাগারের আলো-অন্ধকারে বসে বঙ্গবন্ধু বিষণ্ন বুকে পরিবারের প্রতি অনুভব করতেন অগাধ ভালোবাসা। মাসে দু'বার–অর্থাৎ ১৫ দিন পরপর বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মাসুম বাচ্চা রাসেলসহ বাকি চার সন্তানকে নিয়ে জেলের গেটে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। বঙ্গবন্ধুকে দেখলেই রাসেল আব্বা, আব্বা বলে ডাকত, ইশারা করত। যতবার বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সন্তানদের নিয়ে জেলগেটে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, ততবারই বঙ্গবন্ধু পিতা হিসেবে নিস্তব্ধ বেদনায় মর্মাহত হতেন। 'কারাগারের রোজনামচা' বইতে শেখ রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন: '৮ ফেব্রুয়ারি ২ বছরের ছেলেটা এসে বলে, আব্বা বাড়ি চলো। কী উত্তর ওকে আমি দিব? ওকে

ভোলাতে চেষ্টা করলাম, ও তো বোঝে না আমি কারাবন্দি। ওকে বললাম, তোমার মার বাড়ি তুমি যাও। আমি আমার বাড়ি থাকি। আবার আমাকে দেখতে এসো। ও কি বুঝতে চায়! ... দুঃখ আমার লেগেছে। শত হলেও আমি তো মানুষ আর ওর জন্মদাতা! অন্য ছেলেমেয়েরা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু রাসেল এখনো বুঝতে শেখেনি। তাই মাঝেমধ্যে আমাকে নিয়ে যেতে চায় বাড়িতে।'

৪ বছর বয়সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে শেখ রাসেলের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। প্রথম দিকে পরিবারের কাউকে না কাউকে স্কুলে দিয়ে আসতে হতো। ধীরে ধীরে নিজেই স্কুলের ব্যাপারে আগ্রহী হয় শেখ রাসেল। তখন স্কুলে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হতো সে। স্কুলের মধ্যেই রাসেলের অনেক বন্ধু জুটে যায়। মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তার। বন্ধুবৎসল ছিলো সে। ধীরে ধীরে পড়াশোনায়

'কারাগারের রোজনামচা' বইতে শেখ রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন: '৮ ফেব্রুয়ারি ২ বছরের ছেলেটা এসে বলে, আব্বা বাড়ি চলো। কী উত্তর ওকে আমি দিব? ওকে ভোলাতে চেষ্টা করলাম, ও তো বোঝে না আমি কারাবন্দি

মনোযোগী হয়ে ওঠে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে শেখ রাসেলের জন্য একজন গৃহশিক্ষিকা রাখা হয়েছিল। শেখ হাসিনার স্মৃতিচারণে জানা যায়, শিক্ষিকাকে খুব সম্মান করত শেখ রাসেল। শিক্ষিকার খাবার-দাবারের ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলো। প্রত্যেক দিন শিক্ষিকার জন্য দুটি করে মিষ্টি বরাদ্দ থাকত এবং শিক্ষিকাকে খেতে হতো রাসেলের ইচ্ছানুযায়ী। এভাবেই চলছিল শেখ রাসেলের বাল্যকাল। তখন পরিবারের সবার আদর কেড়ে হইহুল্লোড়ে মাতিয়ে রাখত সে ৩২ নম্বর ধানমন্ডির পুরো বাড়ি। ঐতিহাসিক এই বাড়ি দিনভর রাজনৈতিক নেতাদের আনাগোনা, সভায় মুখরিত থাকত। সেখানেও সবার স্নেহ কাড়ত ফুলের মতো শিশু রাসেল। ছোট্ট একটি বাই-সাইকেল নিয়ে সে ছুটে বেড়াত বাড়ির আঙিনায়। আর ৩২ নম্বরের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন স্নেহময়ী মা তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন দুষ্টু ছেলেটির সাইকেল চালনায়, যেন তার চোখের সামনেই থাকে রাসেল।

'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' বইয়ের ২১তম পৃষ্ঠায় কারাগারে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'আব্বার সঙ্গে প্রতি ১৫ দিন পর আমরা দেখা করতে যেতাম। রাসেলকে নিয়ে গেলে ও আর আসতে চাইত না। খুবই কান্নাকাটি করত। ওকে বোঝানো হয়েছিল যে, আব্বার বাসা জেলখানা আর আমরা আব্বার বাসায় বেড়াতে এসেছি। আমরা বাসায় ফেরত যাব। বেশ কষ্ট করেই ওকে বাসায় ফিরিয়ে আনা হতো। আর আব্বার মনের অবস্থা কী হতো, তা আমরা বুঝতে পারতাম। বাসায় আব্বার জন্য কান্নাকাটি করলে মা ওকে বোঝাতেন এবং মাকে আব্বা বলে ডাকতে শেখাতেন।'

আব্বার সঙ্গে প্রতি ১৫ দিন পর আমরা দেখা করতে যেতাম। রাসেলকে নিয়ে গেলে ও আর আসতে চাইত না। খুবই কান্নাকাটি করত। ওকে বোঝানো হয়েছিল যে, আব্বার বাসা জেলখানা আর আমরা আব্বার বাসায় বেড়াতে এসেছি। আমরা বাসায় ফেরত যাব। বেশ কষ্ট করেই ওকে বাসায় ফিরিয়ে আনা হতো। আর আব্বার মনের অবস্থা কী হতো, তা আমরা বুঝতে পারতাম। বাসায় আব্বার জন্য কান্নাকাটি করলে মা ওকে বোঝাতেন এবং মাকে আব্বা বলে ডাকতে শেখাতেন

শেখ রাসেলকে নিয়ে একটি হৃদয়স্পর্শী কবিতায় প্রখ্যাত কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন:

রাসেল, অবোধ শিশু, তোর জন্য
আমিও কেঁদেছি
তবুও পৃথিবী আজ এমন পিশাচি হলো
শিশুরক্তপানে তার গ্লানি নেই?
সর্বনাশী, আমার ধিক্কার নে!
যত নামহীন শিশু যেখানেই ঝরে যায়
আমি ক্ষমা চাই, আমি সভ্যতার নামে ক্ষমা চাই।

শেখ রাসেল দুরন্ত ছিলো। তার এই দুরন্তপনার বাহন ছিল বাই-সাইকেল। সাইকেলে করেই স্কুলে যেত। পাড়ার আর দশজন সাধারণ ছেলের মতো। বিখ্যাত সাংবাদিক এ বি এম মূসা তার স্মৃতিকথায় শেখ রাসেল সম্পর্কে লিখেছেন, 'কদিন বিকেল পাঁচটার দিকে শাঁ করে ৩১ নম্বরের অপ্রশস্ত রাস্তা থেকে ৩২ নম্বরে ঢুকেই আমার সামনে একেবারে পপাত ধরণিতল! গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল সদ্য শৈশবোত্তীর্ণ ছেলেটি। অতঃপর সাইকেলে উঠে লেকপাড়ে উধাও হলো শৈশবের শেষ প্রান্তের ছোট্ট ছেলেটি। বিকেলে লেকের পূর্বপাড়ে এমনি করে চক্কর মারত। মধ্যবর্তী ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পূর্বপ্রান্তের সাদা একটি দালান পর্যন্ত ছিল এই সাইকেলারোহীর দৌড়ানোর সীমানা। ... এদিকে ৩২ নম্বরের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন স্নেহময়ী মা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন দুষ্টু ছেলেটির সাইকেল-পরিক্রমা যেন সীমাবদ্ধ থাকে।'

ঘাতকের বুলেট যদি শিশু রাসেলের প্রাণ কেড়ে না নিতো তা হলে তিনি হয়তো দেশ, জাতি, বিশ্ব ও মানবতার এক রত্ন হয়ে উঠতেন। হতে পারতেন জগতখ্যাত কোনো বিজ্ঞানী, যুগযন্ত্রণা ধারণ করা কালোত্তীর্ণ পঙ্‌ক্তিমালার রচয়িতা কোনো কবি, মানবমুক্তির বার্তাবাহী বিখ্যাত কোনো নেতা, চিত্রপটে ভাবনা ও দর্শনের নৈর্ব্যক্তিক দ্যোতনায় ঋদ্ধ কোনো চিত্রকর বা বিখ্যাত কোনো ক্রীড়াবিদ। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য জাতির! এই মহা সম্ভাবনাময় ফুলের কলিকে ফুল হয়ে ফোটার আগেই ঘাতকেরা বুটে পিষ্ট করে বুলেটে ঝাঁঝরা করে আমাদের চিরবঞ্চিত রেখেছে তার মাহাত্ম্য লাভ থেকে। ■

লেখক: অনুবাদশিল্পী ও সমাজকর্মী, গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা, সিদীপ

পিছনে ফিরে দেখা
আমাদের নারীসমাজ

শাহজাহান ভুঁইয়া

দার্শনিক বিচারে মানবোন্নয়ন মূলত মানব-মুক্তিকে বোঝায়। প্রকৃতি ন্যায়বিচারের অংশ হিসেবে মানবসমাজে নারীপুরুষের সংখ্যায় ভাবরসাম্য বজায় রাখে। যা সংখ্যায় আধাআধি। তবে সমাজের বিবর্তনে পুরুষ প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং একটি পুরুষকেন্দ্রিক ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছে। যা ভারসাম্যমূলক প্রাকৃতিক সমতার নীতিকে সম্পূর্ণ লংঘন করেছে।

নারীকে পুরুষের অধীন করে তার স্বাধীনতা সংকুচিত করার ফলে প্রচলিত মানবোন্নয়ন হয়েছে ভারসাম্যহীন। এই লিঙ্গবৈষম্য অতীতে সর্বত্র ঘটেছে আর বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার মত প্রান্তিক দেশগুলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাতৃতান্ত্রিকতা অবশ্য এখনও কোথাও কোথাও দেখা যায়, বিশেষত এশিয়ার দেশগুলোতে। নিকট অতীতে এইসব মহাদেশ তৎকালীন পরাশক্তি ইউরোপের পদানত হয়েছিল।

পৃথিবীর দুর্বলতম প্রজাতি হোমো সেপিয়েন্স দূর অতীত থেকে একটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। ইতিহাসের পাতা ভরেছে রাজরাজড়ার হাতে যুদ্ধ, ধ্বংস ও দখলের কাহিনী দিয়ে। বিবর্তনের শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক স্তরে বেঁচে থাকার সামষ্টিক সংগ্রামে নারী কেবল যে পুরুষের সমান ছিল তাই নয়, তাকে পালন করতে হয়েছে সন্তানের জন্ম ও লালনপালনের মাধ্যমে প্রজাতি পুনরুৎপাদনের বাড়তি দায়িত্ব। এরও আগে হয়ত প্রজাতি পুনরুৎপাদনের ভার পুরোটা তার একাই বহন করতে হত।

বুদ্ধির অপর্যাপ্ত বিকাশের স্তরে আদি হোমো সেপিয়েন্স জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়েছে নারীর ভূমিকার কারণে। তারা সন্তান জন্ম দিত, আহার জোগাড় করত ও তাদেরকে পালন করত–অন্য যে কোনো প্রাণীর চেয়ে যে কাজে মানুষকে বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। এসব কাজে পুরুষকে বাধ্য করার কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না, তারা ইচ্ছেমত পেশীশক্তি কাজে লাগাত। নারীকেই বহন করতে হত প্রজাতি পুনরুৎপাদনের মূল দায়িত্ব। নারীর ভূমিকা ছাড়া এসময়ে মানবজাতির টিকে থাকা ছিল অকল্পনীয়।

বর্তমান বিশ্বের জনপ্রিয় লেখক ইউভাল নোয়া হারারি তার ‘সেপিয়েন্স’ গ্রন্থে সত্তর হাজার বছর আগে উৎপত্তির পর মানুষের অগ্রযাত্রায় তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো তিরিশ হাজার বছর আগে বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব, এরপর ১০ থেকে ১২ হাজার বছর আগে কৃষি বিপ্লব এবং ৫০০ বছর আগে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। এসবই মানুষের উন্নয়নের ইতিহাসে গতি সঞ্চার করেছে কারণ এসব বিপ্লব সমাজে প্রচলিত দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তির চালিকাশক্তি। কিন্তু মানুষের ইতিহাস নারীর মুক্তি সাধনে ব্যর্থ হয়েছে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে পৃথিবীতে এখনও কিছু মাতৃতান্ত্রিক সমাজ আছে, অতীতে পরিস্থিতির চাপে যাদের উদ্ভব। যদিও

মুক্তির পথে নারীকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, তাই বর্তমানের মানবোন্নয়ন আংশিক। নারী যদি পুরুষের সমান মুক্ত হয়, তবে কেবল ন্যায়ই প্রতিষ্ঠা পাবে না, তার মুক্ত শক্তি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধন করে মানবতাকে সম্পদশালী করবে। সুতরাং নারীকে অর্জন করতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, উপযুক্ত আয় ও জীবিকা, পর্যাপ্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসুবিধা, নিরাপত্তা, রাজনৈতিক ক্ষমতা ইত্যাদি যাতে তার অবদমিত স্বপ্ন বাস্তবতায় রূপ পায়–ইতিহাস হয় নারীর গল্পভিত্তিক

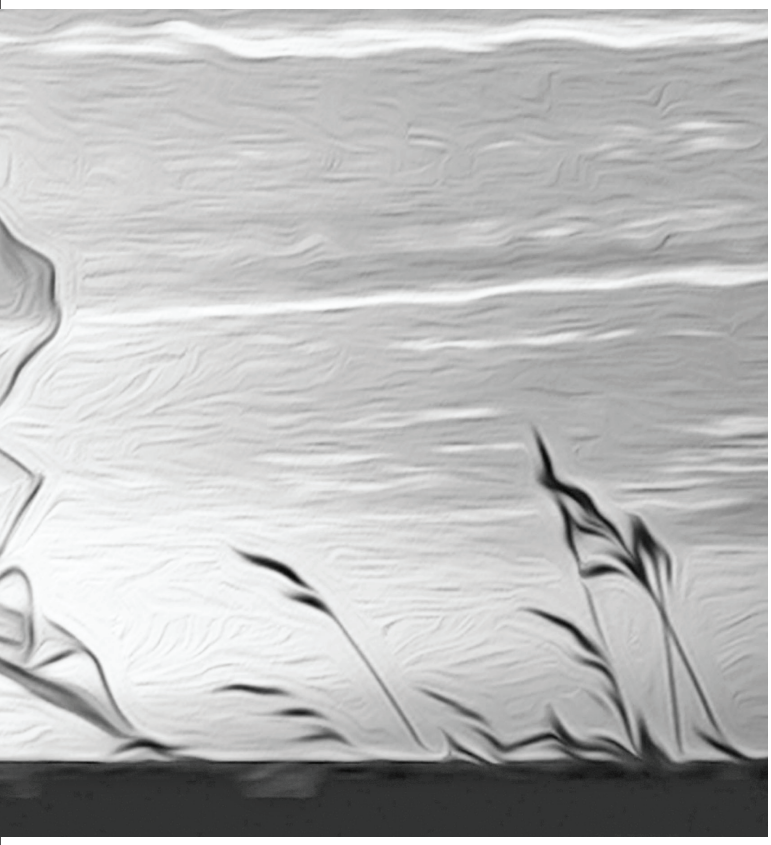

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের তুলনায় এগুলোকে বেশি স্বাধীন মনে হয়, এসব সমাজে নারীকে দ্বিগুণ ভার বহন করতে হয়–একদিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক দায়িত্ব, অন্যদিকে সামাজিক-অর্থনৈতিক ভূমিকা। যদি এখন কেউ বাংলাদেশের মত কোনো পিতৃতান্ত্রিক দেশ থেকে কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে বেড়াতে যান, তবে মেকং নদীর ধার দিয়ে মটরসাইকেল চালানো শত শত নারী দেখে আশ্চর্য হবেন।

১৯৯২ সালে কম্বোডিয়ায় উনটাক-এর (United Nations Transitional Authority) অধীনে চাকুরির সুবাদে প্রশিক্ষণের জন্য আমাকে দু মাস নমপেনে থাকতে হয়েছিল। প্রশিক্ষণ শেষে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আমি বেরুতাম তখনকার যুদ্ধবিধ্বস্ত কিন্তু একসময় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সৌন্দর্যময় রত্ন শহরটিকে দেখতে। আমি সাধারণত মেকং নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম। পঞ্চাশ সিসি হোন্ডা চালানো অসংখ্য সুন্দরী নারীদের দেখে আমি অবাক হতাম। আমি সাধারণত কেন্দ্রীয় সাতমাই বাজারটিতে যেতাম। সেখানে তারি নামের একটি মেয়ের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে একজন স্কুলশিক্ষকের মেয়ে, ১৭ বা ১৮ বছরের সুন্দরী তরুণী। জানতে পারলাম যে এই দোকানের আয় দিয়ে সে সংসার চালানোয় বাবামাকে সাহায্য করে ও নিজের বিয়ের খরচ সঞ্চয় করে।

মুক্তির পথে নারীকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, তাই বর্তমানের মানবোন্নয়ন আংশিক। নারী যদি পুরুষের সমান মুক্ত হয়, তবে কেবল ন্যায়ই প্রতিষ্ঠা পাবে না, তার মুক্ত শক্তি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধন করে মানবতাকে সম্পদশালী করবে। সুতরাং নারীকে অর্জন করতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, উপযুক্ত আয় ও জীবিকা, পর্যাপ্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসুবিধা, নিরাপত্তা, রাজনৈতিক ক্ষমতা ইত্যাদি যাতে তার অবদমিত স্বপ্ন বাস্তবতায় রূপ পায়–ইতিহাস হয় নারীর গল্পভিত্তিক।

মানবোন্নয়নের লক্ষ্যে নারীর উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হবে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সুসমঞ্জস করতে নারীর বঞ্চনা দূর করতে হবে। বাংলাদেশে নারী-উন্নয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহ নারীমুক্তির পক্ষে কথা বলবে। সরকারি-বেসরকারি নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচি, এনজিওদের প্রচেষ্টা ও অর্থনৈতিক চাপের কারণে প্রচলিত পর্দা থেকে বেরিয়ে আসায়, পোশাকশিল্পের মত বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় এবং আরও নানা কারণে নারীর অগ্রগতিতে বাংলাদেশ আজ ভারতীয় উপমাহাদেশে উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেছে। তবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল নারীকাহিনী রচনায় আমাদের নারীসমাজকে এগিয়ে যেতে হবে আরও অনেক দূর। ■

লেখক: গবেষক ও ভাইস চেয়ারম্যান, সিদীপ

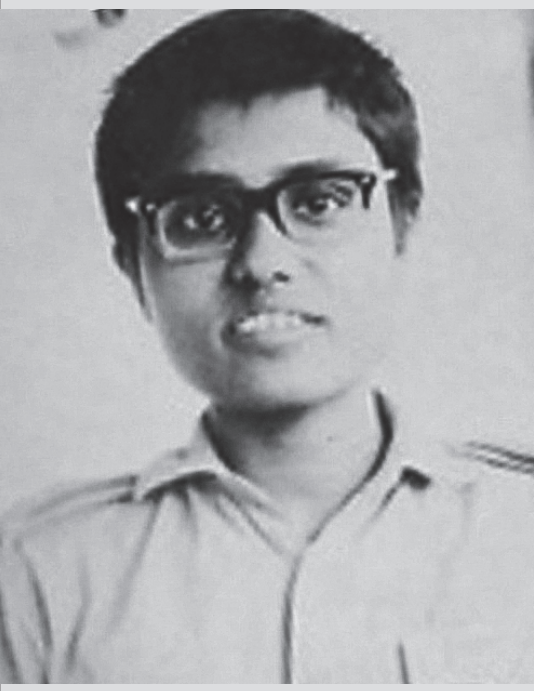

‘সেই সময় আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম যে, এতো বড় দলের মধ্যে ছদ্মবেশে একজন মেয়ে রয়েছে, এ বিষয়কে তারা কিভাবে নিবে! কিন্তু দেখা গেল, আমার পরিচয় জানার পর তারা সবাই আমাকে ঘিরে ধরল। একজন বৃদ্ধ এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ‘মা, আমরা আর ভয় করি না। আমাদের মেয়েরা যখন আমাদের সাথে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করছে তখন আমাদের বিজয় হবেই হবে’

ব্যতিক্রমী দুঃসাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা

শিরিন বানু মিতিল

সালেহা বেগম

শিরিন বানু মিতিলের সাথে আমার পরিচয় ১৯৮৩ সালে কর্মক্ষেত্র বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে (বার্ড) কুমিল্লায়। সহজ-সরল মিশুক প্রকৃতির একজন মহিলা। আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট। পোষাক পরিচ্ছদে সাদামাটা, খানিকটা উচ্চ স্বরে কথা বলার অভ্যাস। পরবর্তীতে কাজের মাধ্যমে জানাশোনা এবং আন্তরিকতা। দেখেছি অত্যন্ত ধৈর্যশীল এই নারী নানা সমস্যা মেকাবেলা করেছেন জীবনভর। নীতিতে অটল থেকেছেন এবং নিজের সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন নিজের মস্তিষ্কে ধারণ করা নীতিবোধ। মুক্তিযুদ্ধ যা বাঙালি জাতির জন্য এক বীরত্বপূর্ণ গৌরবগাথা, বড়ই অহংকারের এবং হৃদয় ছোঁয়া আবেগের একটি অংশ, সেই গৌরবগাথার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন এই মিতিল।

আমরা জানি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধ করেছেন নারী মুক্তিযোদ্ধারাও। নারী মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে গোলাবারুদ, অস্ত্র ও অন্যান্য রসদ পৌঁছে দিয়েছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র হাতে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে শামিল হয়েছেন সম্মুখ যুদ্ধেও। তেমনিই একজন দুর্ধর্ষ সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন শিরিন বানু মিতিল। তিনি একজন নারী হয়েও যুদ্ধ করেছিলেন পুরুষের বেশে।

শিরিন বানুর জন্ম ১৯৫০ সালের ২ সেপ্টেম্বর পাবনায়। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ২৫ মার্চ রাতে পাবনাতেও হামলা করেছিল পাকিস্তানি হানাদার। জারি হয় সান্ধ্য আইন। ২৬ মার্চ তারা রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার শুরু করে। সাধারণ মানুষের ওপর নেমে আসে অত্যাচার। ২৭ মার্চ রাতে পুলিশ লাইনে যুদ্ধ শুরু হয়। জেলা প্রশাসন ও জনগণ একত্রিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ঘরে ঘরে মেয়েরাও যুদ্ধে নেমে পড়ে, অস্ত্র হিসাবে হাতে তুলে নেয় গরম পানি, অ্যাসিড বাল্ব, বটি আর দা। ২৮ মার্চ পাবনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে হানাদারদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন মিতিল। এই যুদ্ধে মিতিলই ছিলেন একমাত্র নারীযোদ্ধা। হানাদারদের ৩৬ জনই এই যুদ্ধে নিহত হয়। শহীদ হয়েছিলেন দুই মুক্তিযোদ্ধা।

মিতিলের দুই চাচাত ভাই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন তাদের মায়ের নির্দেশে। তাদের একজন একদিন মিতিলকে বললেন, প্রীতিলতা তো প্যান্ট শার্ট পরতেন, তুই তো পরতে পারিস। সাথে সাথেই তিনি ভাইদের প্যান্ট, শার্ট ও জুতো নিলেন। চুল তাঁর ছোট করে ছাঁটাই ছিল। তাই তাঁকে দেখে অচেনা কেউ ছেলে হিসাবেই ভেবে নিত। চাচাতো ভাই জিঞ্জিরের কাছ থেকে মাত্র আধা ঘন্টায় থ্রি নট থ্রি চালনা শিখে নিলেন মিতিল এবং সম্মুখযুদ্ধে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন পুরুষের বেশে এই নারী।

পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ৩১ মার্চ একটি কন্ট্রোল রুম বসানো হয়। পাবনার নগরবাড়ি ঘাটের কাছে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয় ৯ এপ্রিল। সে সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে পুরো কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব দেওয়া হয় শিরিন বানুর উপর। এছাড়া নগরবাড়ি ঘাট, আতাইকুলা ও কাশীনাথপুরের যুদ্ধে দোর্দণ্ড প্রতাপে যুদ্ধ করেছিলেন শিরিন বানু। পাকিস্তানিদের আক্রমণ শুরু হয় আকাশ পথে। পাবনার পাশের জেলা কুষ্টিয়ায় তখন প্রতিরোধ প্রায় ভেঙ্গে

পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা তখন চুয়াডাঙ্গার পথে রওনা হয়। গাড়িতে জায়গা না হওয়ায় মিতিল ও ওর এক ভাই থেকে যান কুষ্টিয়া। ওরা পরে কুষ্টিয়া থেকে চুয়াডাঙ্গা রওনা হন অন্য দলের সাথে। সেদিনের ঘটনা মিতিলকে আজীবন নাড়া দিত, শুনেছি ওর কাছে। মিতিলের মুখে শোনা গল্পটি ওর ভাষায়ই এখানে তুলে ধরছি।

মিতিল বলেছেন, "আমরা যখন কুষ্টিয়া থেকে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলাম তখন একদিন গভীর রাতে আমাদের দলটিকে পথের মাঝে আটকে দেয়া হয়। মূলত ওই অঞ্চলে পাকিস্তানিদেরকে প্রতিরোধ করার জন্যই এই সতর্কতামূলক পাহারায় যারা নিয়োজিত ছিলেন তারা আমাদের পরিচয় জানতে চায়। আমরা সত্যি পরিচয় দিলেও প্রথমে তারা সেটা বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না। এর কারণ আমাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের একজন ছিলেন এবং তার ভাষার টানটি ছিল বিহারীদের মতো। আমরা যে সত্যি মুক্তিযোদ্ধা তারা তার প্রমাণ চাইল। এই পরিস্থিতিতে আমাদের একজন বলল, 'আপনারা কি আকাশবাণীতে শিরিন বানুর কথা শুনেছেন?' তাঁরা সম্মতিসূচক বার্তা দিলেন। তিনি জানালেন, 'আমাদের মধ্যে সেই শিরিন বানু রয়েছেন।'"

শিরিন বানু বললেন, "সেই সময় আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম যে, এতো বড় দলের মধ্যে ছদ্মবেশে একজন মেয়ে রয়েছে, এ বিষয়কে তারা কিভাবে নিবে! কিন্তু দেখা গেল, আমার পরিচয় জানার পর তারা সবাই আমাকে ঘিরে ধরল। তাদের মধ্যে ছিলেন একজন বৃদ্ধ, তিনি আমার কাছে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'মা, আমরা আর ভয় করি না। আমাদের মেয়েরা যখন আমাদের সাথে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করছে তখন আমাদের বিজয় হবেই হবে।'

"তাঁর কথা শুনে খুব অবাক হয়েছিলাম, মনে হয়েছিল, কিভাবে সারাদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য উদ্দীপনা ও উৎসাহ নিয়ে পরস্পরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে! এর কিছুদিন পরই ভারতীয় দা স্টেটসম্যান পত্রিকায় মানস ঘোষের একটি লেখা ছাপা হয়। এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'শিরিনকে আমার অসামান্য লেগেছিল। আমি যশোর, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের খবর জোগাড় করতে গিয়ে প্রচুর মুক্তিযোদ্ধাকে দেখেছি। কিন্তু কোনো তরুণীকে আমার নজরে পড়েনি। ... আমি রোজ অফিসের গাড়ি করে দর্শনা হয়ে চুয়াডাঙ্গা যেতাম। চুয়াডাঙ্গা ছিল মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমা অঞ্চলের সদর দপ্তর। কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী ছিলেন ওই অঞ্চলের প্রধান। একদিন সেখানে গিয়ে দেখা হলো পাবনার ডিসি নুরুল কাদেরের সঙ্গে। তিনি বললেন, চুয়াডাঙ্গায় তিনি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিতে এসেছেন। কেননা পাকিস্তানি বাহিনী পাল্টা আক্রমণের ছক কষে পাবনা পুনঃদখল

তাঁর কথা শুনে খুব অবাক হয়েছিলাম, মনে হয়েছিল, কিভাবে সারাদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য উদ্দীপনা ও উৎসাহ নিয়ে পরস্পরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে

করতে চাইছে। এরপর একটা প্রায় অকেজো বাষ্পচালিত ইঞ্জিন জোগাড় করে তার সঙ্গে দুটি রেলের বগি জুড়ে স্তূপীকৃত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঈশ্বরদীর পথে পাড়ি জমালাম। সে ছিল এক রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা। ভোর পাঁচটায় ঈশ্বরদী পৌঁছে দেখি অনেক মুক্তিযোদ্ধা। তখনই চোখে পড়ে শিরিনের উপর। শারীরিকভাবে ইকবাল বা রফিকুল ইসলামের মতো বলিষ্ঠ মুক্তি সেনা তিনি নন। বরং একটু শীর্ণ ও লাজুক প্রকৃতির। আমার কাছে এসে বললেন, 'নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত।' আমার হাত থেকে প্রায় জোর করে এয়ার ব্যাগটি কেড়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দামী কিছু নেই তো?' উত্তর দেয়ার আগেই বলে উঠলেন, 'যুদ্ধের খবর নিতে এতো ঝুঁকি নিয়ে আমাদের পাবনায় এসেছেন। আমাদের মেহমানদারি করতে দিন একটু।'

"ফলে এরপর আমার আর পুরুষের বেশে যুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি।"

কিছুদিন পরই দীর্ঘ প্রশিক্ষণের জন্য ভারত চলে যান শিরিন বানু। প্রথমে কয়েকজন নারী আশ্রয় শিবিরে ঘুরে ঘুরে মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দল গঠন শুরু করেন। পরবর্তীতে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন মোট ৩৬ জন নারী। ভারতের গোবরা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। আস্তে আস্তে সদস্য সংখ্যা হয়েছিল ২৪০ জনেরও বেশি।

অস্ত্রের অভাব থাকায় নারীদের গ্রুপের হাতে অস্ত্র সরবরাহ করা সম্ভব ছিল না। তাই প্রথম দলের একটি অংশ আগরতলায় যায় মেডিকেল কোরের সদস্য হিসাবে। বাকিরা বিভিন্ন এলাকায় ভাগ হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেন। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কলকাতায় বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তব্য, কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন মিতিল।

একাত্তরে যে কজন অদম্য দেশপ্রেমিক নারী প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সহকর্মী মিতিলের নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ২০১৬ সালের ২১ জুলাই এই কিংবদন্তি মুক্তিযোদ্ধা পরলোক গমন করেন।

অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও মর্যাদার লড়াইয়ে অসীম সাহসী এই বীর নারীকে আজ অবারও গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি। দেশকে ভালবেসে জীবনকে উৎসর্গ করার সাহস তিনি দেখিয়েছেন। মিতিলের মতো দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমরাই নিজেদের আলোকিত করতে পারি। তিনি আমাদের অহংকার। শিরীন বানু মিতিল আমার সহকর্মী ছিলেন বলে আমি গর্ব অনুভব করছি। তাঁর জন্য অশেষ ভালোবাসা ও অসীম শ্রদ্ধা। ■

লেখক: গবেষক ও সাধারণ পর্ষদ সদস্য, সিদীপ

শিক্ষায় অগ্রগতি

দেওয়ান মামুনূর রশিদ

বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করেছে। করোনা মহামারির মত প্রকট বিশ্ব সংকট মোকাবেলা করেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবেশী অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল) ১৭টি সূচকের মধ্যেও বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি সূচকে অগ্রসরমান দেশের তালিকায় রয়েছে। এই ৫০ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাকমিশনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদাকে। এই প্রথম ব্যাপক সংখ্যক ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়।

বর্তমানে শিক্ষায় জেন্ডারসমতা নিশ্চিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে বই পাচ্ছে। এ বছর প্রায় ৩৮ কোটি বই বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার নিয়ে সকলের মধ্যে উদ্বেগ কাজ করেছিল। নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই উদ্বেগ যথেষ্টভাবে কমে এসেছে। বর্তমানে প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার ১৮ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ২০১০ সালেও ছিল ৩৯.৫ শতাংশ।

তবে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ সরকারের আছে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনো বেশ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিশেষ করে দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল, নদী ও সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ অঞ্চলসমূহে নিম্নআয়ের মানুষের জীবন-জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে বেশ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমি দেখেছি শিশুরা বাল্যকালেই পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের সাথে নানা কাজে অংশগ্রহণ করে, এজন্য তারা শিক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে দূরে সরে যায়। তবে বিভিন্ন এনজিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে আমাদের টিকে থাকতে হলে কারিগরি শিক্ষা তথা কর্মমুখী ও জীবনমুখী শিক্ষার প্রতি ধাবিত হতে হবে। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনে কর্মমুখী ও জীবনমুখী শিক্ষা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ছিলো। বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হলে কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি আরো জোর দিতে হবে।

শিক্ষাখাতে আরেকটি অগ্রগতি হলো, প্রাথমিক শিক্ষায় অধিকাংশ হারে নারী শিক্ষকের অংশগ্রহণ।

তবে এখনো আমরা শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দের দিক থেকে পিছিয়ে আছি। এখনো জাতীয় বাজেটের ১২ থেকে ১৪ শতাংশ অথবা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) মাত্র দুই থেকে আড়াই শতাংশের মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষা বাজেট আবদ্ধ রয়েছে। এ থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হবে, কেননা শিক্ষার চেয়ে বড় বিনিয়োগ আর কিছু নেই। বাজেট বরাদ্দ বেড়ে গেলে শিক্ষার আরো বিকাশ ঘটবে, নারীর ক্ষমতায়ন বেড়ে যাবে, স্বাস্থ্য ও তথ্য প্রযুক্তিক্ষেত্রেও ব্যাপক সমৃদ্ধি আসবে অর্থাৎ শিক্ষার উন্নতি ঘটলে সামগ্রিক উন্নতি ঘটবে। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কমপক্ষে জিডিপির ছয় শতাংশে উন্নীত করা দরকার।

শিক্ষকদের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে এবং বিদেশে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি এমপিওভুক্তকরণ, জাতীয়করণসহ শিক্ষক নিয়োগ কাঠামো উন্নতকরণ, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি এসেছে। সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতনভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেও অসন্তোষ রয়েছে যা আমরা সরেজমিন পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করেছি। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকদের সাথে আলাপচারিতায় মর্যাদা বৃদ্ধি করার বিষয়ে অসন্তোষের নানা তথ্য উঠে এসেছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আরেকটি সাফল্যের কথা তুলে ধরা দরকার। সরকার কেবলমাত্র বাংলাভাষীদের জন্য বই প্রস্তুত করছে তা নয়, ৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় বই প্রকাশ করা হয়েছে। একজন মানুষকেও বাদ দিয়ে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের প্রত্যেক নাগরিককে সাথে নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। পাশাপাশি শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারের উদ্যোগ রয়েছে। বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের

এখনো জাতীয় বাজেটের ১২ থেকে ১৪ শতাংশ অথবা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) মাত্র দুই থেকে আড়াই শতাংশের মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষা বাজেট আবদ্ধ রয়েছে

ক্ষেত্রেও সরকারের সফলতা রয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের পাশাপাশি শ্রবণ-প্রতিবন্ধী ও মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সরকারের শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে।

শিক্ষার সাথে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ লক্ষ্যে সরকার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে। তবে আকাশ-সংস্কৃতির এই যুগে এসে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করতে হবে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। সন্তান মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স উপকরণ ব্যবহার করে বিপথগামী হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে অভিভাবকদের ব্যাপক দৃষ্টি রাখতে হবে। এজন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে সমন্বিত সচেতনতামূলক কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে।

বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় সাফল্য ঘটেছে, ৩৮ লক্ষ মানুষ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। পাকিস্তান আমলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৬টি, এখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬০টি। এছাড়া ১০৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭১টি। পাকিস্তান আমলে সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ৭টি, এখন ৩৭টি, সেনাবাহিনী পরিচালিত ৬টি এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে ৭২টি। মোট মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ১১৫টি। তখন একটি সরকারি ডেন্টাল কলেজ ছিলো। এখন সরকারি ১টি ডেন্টাল কলেজ ও ৮টি ডেন্টাল ইউনিট রয়েছে। বেসরকারি ১২টি ডেন্টাল কলেজ ও ১৪টি ডেন্টাল ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোট ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিটের সংখ্যা ৩৫টি। এছাড়া নার্সিং, টেক্সটাইল ও মেরিন এডুকেশন থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এখন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা বের হচ্ছে তাদের জন্য কর্মজগৎ সৃষ্টি করতে হবে। দেশে উচ্চশিক্ষিতদের জন্য কর্মজগৎ কম হওয়ায় মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি শিক্ষা ও গবেষণায় ব্যাপক বরাদ্দ দিতে পারি তাহলে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং মেধা পাচার রোধ হবে।

বর্তমানে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী ডিজিটালাইজড কনসেপ্টের আওতায় এসেছেন। তৃণমূল পর্যন্ত অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পাশাপাশি অভিভাবকগণও ডিজিটালাইজড কনসেপ্টের আওতায় এসেছেন।

বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি অভিশাপ ছিল সেশনজট। বর্তমানে সেশনজট মুক্ত হয়ে শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

তবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের এক দশকের অধিককাল অতিক্রম হওয়ার পরও একটি পূর্ণাঙ্গ 'শিক্ষা আইন' না হওয়া দুঃখজনক। শিক্ষকদের প্রতি আমরা যদি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতে পারি এবং শিক্ষাখাতে উপযুক্ত বিনিয়োগ করতে পারি তাহলে শিক্ষাজগৎ আমাদেরকে বিশ্বের নেতৃত্বস্থানে পৌঁছে দেবে। ■

লেখক: আইনজীবী ও প্রধান সম্পাদক, মাসিক শিক্ষাসংবাদ বিচিত্রা

আমাদের বিজ্ঞানচর্চা

আনোয়ারুল আজিম খান অঞ্জন

পঞ্চাশ বছর মানে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আমরা পেরিয়ে এসেছি। কি ছিলো আর কি পেয়েছির হিসেব যদি করতে যাই তা হলে অনেক বড় তাত্ত্বিক কথা চলে আসবে। পঞ্চাশ বছরে পৃথিবী পঞ্চাশটা পূর্ণ ঘূর্ণন দিয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশই পঞ্চাশটি বছর পার করে এসেছে। পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বয়সও পঞ্চাশ বছর বেড়েছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে অভিজ্ঞতার ঝুলিটাও ভারি হয়, সেই সাথে ভারি হয় জ্ঞানের ভাণ্ডার।

আজকের এই পঞ্চাশ বছরের অতিক্রান্ত পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আরও একজনের নাম না উচ্চারণ করলেই নয়, তিনি এই জাতির স্বাধীন ভূখণ্ড, স্বশাসন ও স্বাধিকারের জন্য প্রায় কিশোর বয়স থেকেই নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। যদিও তিনি বিজ্ঞানি নন, নন কবি, নন দার্শনিক কিংবা অতি বিপ্লবী–তারপরও সব ছাপিয়ে এই জাতিকে নিয়ে মহাকাব্যিক দার্শনিক চিন্তার এক সফল রূপকার তিনি

প্রতিদিনের হিসাবে আমাদের এই পৃথিবী ২.৫৭৩ মিলিয়ন কিলোমিটার পথ মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছে। সেই হিসেবে আমরা পঞ্চাশ বছর পূর্বের থেকে এখন ৪৭,০০০ মিলিয়ন কিলোমিটার বা ৪৭ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছি। এই দূরত্ব পেরিয়ে এসে আমরা এখন কোথায়? আমাদের অর্জন কি?

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যতক্ষণ একটা জাতির কৃষ্টি-কালচারের মধ্যে মিলেমিশে একাকার না হয় ততক্ষণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শুধুই বিজ্ঞান বইয়ের কিছু অধ্যায় মাত্র। পশ্চিমের দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশ ও জাতিই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ধন জ্ঞান করে ৫০০ বছরেরও অধিক সময়ের যে পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে তা তারা এখন শুধুই ভোগ নয়, বিকাশও ঘটাচ্ছে। এ সত্যটুকু অন্তত তারা বুঝতে পেরেছিলো, বিজ্ঞানেই স্বস্তি, বিজ্ঞানেই মুক্তি। পশ্চিমা বিশ্বের এ প্রভূত উন্নয়নের কথা বলতে গেলেই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে ইউরোপ জুড়ে শিল্প বিপ্লবের চিত্র। একটা বিপ্লবের সংঘটন কালকে আমরা কিছু কাল দিয়ে নির্দিষ্ট করতে চাইলেও বিপ্লবের পটভূমিতে থাকে এক দীর্ঘ সময়ের সুসংহত যাত্রা।

বিজ্ঞানের চর্চা মধ্যযুগের মুসলিম মনীষীরা যতদিন পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন, ইসলামের প্রচার ও প্রসার কিন্তু ততদিন পর্যন্তই দুর্দমনীয়ভাবেই ঘটেছে। যখন মুসলিম পণ্ডিতদের মাঝে বিজ্ঞানচর্চায় ভাটা পড়েছে ইসলামেরও দুর্দিন শুরু হতে আর সময় লাগেনি।

ঊনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলাভাষী, বাঙ্গালি ও বাংলাদেশি বিজ্ঞানিদের কিছু উল্লেখযোগ্য কীর্তি রয়েছে। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, স্বাধীন বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরে এই অর্জন খুব একটা ধারাবাহিক নয়। আমাদের সন্তানদের প্রযুক্তি পণ্য ব্যবহারে আমরা যতটা উৎসাহ দেই, প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনে যে জ্ঞানের সাধনার প্রয়োজন সে ব্যাপারে আমরা বরাবরই উদাসীন। আমাদের সন্তানেরা রাস্তায় গাড়ি ভাঙ্গতে যতটা পটু, ভাঙ্গা ইঞ্জিন মেরামতে তারা ততটাই আনাড়ি। বিশাল সম্ভাবনাময় মস্তিষ্কগুলোকে বিপুল অপচয়ের হাত থেকে বাঁচাতে হলে কীর্তিমান বাঙ্গালিদেরকে আমাদের বুকে ধারণ করতেই হবে। আদর্শ বুকে ধারণ করে, লক্ষ্যের দিকে অবিচল যাত্রা অতি অবশ্যই একদিন আমাদেরকে কল্যাণময় প্রভাতে পৌঁছে দেবে।

আজকের এই পঞ্চাশ বছরের অতিক্রান্ত পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আরও একজনের নাম না উচ্চারণ করলেই নয়, তিনি এই জাতির স্বাধীন ভূখণ্ড, স্বশাসন ও স্বাধিকারের জন্য প্রায় কিশোর বয়স থেকেই নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। যদিও তিনি বিজ্ঞানি নন, নন কবি, নন দার্শনিক কিংবা অতি বিপ্লবী–তারপরও সব ছাপিয়ে এই জাতিকে নিয়ে মহাকাব্যিক দার্শনিক চিন্তার এক সফল রূপকার তিনি। জীবনের সবচাইতে মূল্যবান সময় আর পুরো জীবনটার বিনিময়ে আমাদের দিয়ে গেছেন এই ৫৬০০০ বর্গমাইল। যেখানে আমরা আপন স্বপ্ন বুনি এক খোলা আকাশের নিচে। চির শান্তিতে ঘুমান আপনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। আমরা সাড়ে সতের কোটি বহন করে চলেছি আপনার রক্তঋণ।

শুভ-কল্যাণময়-সফল ও সার্থক এক বাংলাদেশের স্বপ্ন তো আমরা দেখতেই চাই, সেই জন্য না হয় দুয়ার আগলে বসে থাকবো আরও পঞ্চাশটা বছর। শহীদের রক্তে স্নাত যে পূণ্যভূমি শতবর্ষে হলেও সেই স্বপ্ন ধরা দিতে বাধ্য। ■

লেখক: লেখক ও প্রকৌশলী

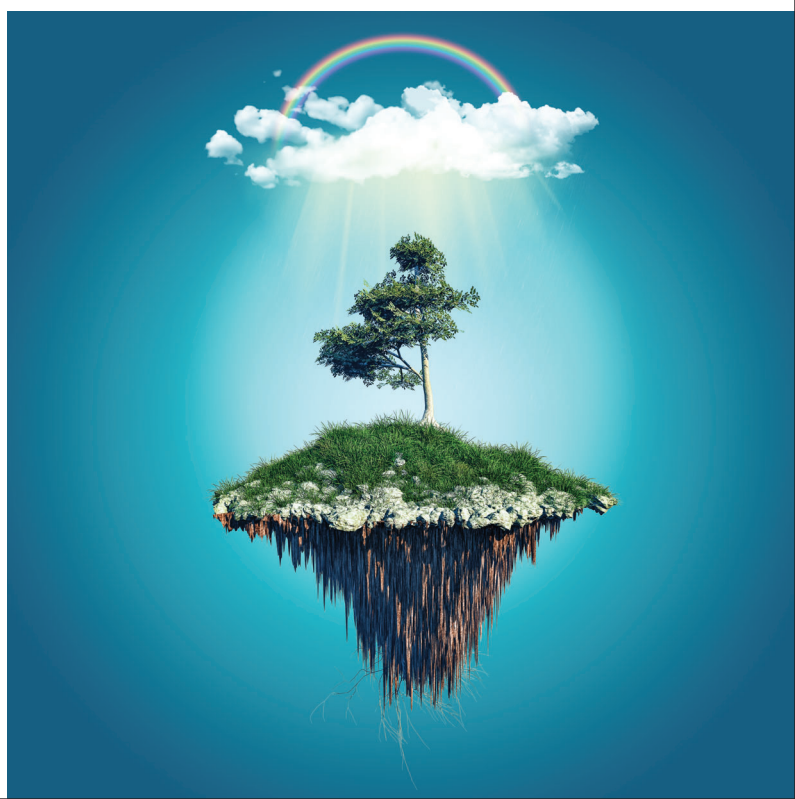

সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে ও ব্রাঞ্চ পর্যায়ে
শেখ রাসেল দিবসে আলোচনা ও দোয়া

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিশুপুত্র শেখ রাসেলকে হত্যা বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে নৃশংসতম ঘটনাসমূহের একটি। এ বছর থেকে তার জন্মদিন বাংলাদেশে জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ১৮ অক্টোবর ২০২১এ শেখ রাসেল দিবসে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মী। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদার সভাপতিত্বে এ আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল আলোচনা করেন সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া। এ ছাড়াও আলোচনা করেন সংস্থার গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা মনজুর শামস। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন সংস্থার গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান।

শেখ রাসেলসহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন সিদীপের মহাব্যবস্থাপক (ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস) এ. কে. এম. শামসুর রহমান।

আলোচনায় জনাব মনজুর শামস বলেন, “শেখ রাসেল ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছার পাঁচ সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। ১৯৭৫এর ১৫ই আগস্ট দানব

জিনসার শাখায় শেখ রাসেল দিবস পালন

শিবগঞ্জ শাখায় শেখ রাসেল দিবস পালন

শিক্ষাকেন্দ্র: ভবেরচর শাখা

> "আজ শেখ রাসেল দিবসের গুরুত্ব হচ্ছে, বাংলাদেশের শিশুদের সমস্ত অধিকার রক্ষা করা। এগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিশুর জীবন সুরক্ষায় সমস্ত অধিকার।

ঘাতকের বুলেটের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, 'আমি মায়ের কাছে যাবো'। কিন্তু তার সেই মিনতিতে কান দেয়নি নরপশুরা, বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল শিশু রাসেলের কোমল দেহ।"

সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া বলেন, "আজ শেখ রাসেল দিবসের গুরুত্ব হচ্ছে, বাংলাদেশের শিশুদের সমস্ত অধিকার রক্ষা করা। এগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিশুর জীবন সুরক্ষায় সমস্ত অধিকার। সমাজের রূপান্তর যদি 'জোর যার মুল্লুক তার' থেকে 'অধিকার যার শক্তি তার' হয় এবং রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠান যদি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষায় কাজ করে তবে ভবিষ্যতের শিশুরা তাদের অধিকার নিয়ে সুরক্ষিত থাকবে এবং সুনাগরিক হবে। শিশুর সকল প্রকার অধিকার রক্ষায় ও বাস্তবায়নে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। সিদীপ তার নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু-অধিকার বাস্তবায়নে সিদীপ কাজ করে যাবে– শেখ রাসেল দিবসে এই আমাদের অঙ্গিকার।"

ব্রাঞ্চ পর্যায়ে

সিদীপের প্রতিটি শাখা কার্যালয়ে যথাযথ মর্যাদায় শেখ রাসেল দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে শাখা কার্যালয়ের দৃশ্যমান জায়গায় ব্যানার প্রদর্শন করা হয় এবং সকল কর্মী সমবেত হয়ে শেখ রাসেলের জীবনের ওপর আলোচনা করেন এবং তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন।

“শেখ রাসেল ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছার পাঁচ সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। ১৯৭৫এর ১৫ই আগস্ট দানব ঘাতকের বুলেটের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, ‘আমি মায়ের কাছে যাবো’। কিন্তু তার সেই মিনতিতে কান দেয়নি নরপশুরা, বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল শিশু রাসেলের কোমল দেহ।”

শিক্ষাকেন্দ্র: ভাঙ্গুড়া শাখা

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির সকল শিক্ষাকেন্দ্রে

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে প্রধান কার্যালয় থেকে পাঠানো শেখ রাসেলের জীবনীর ওপর লিখিত রচনা অনুসরণ করে শিক্ষিকাগণ শিসক শিশুদের সামনে শেখ রাসেলের জীবন-ইতিহাস তুলে ধরে আলোচনা করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

কৈশোর কর্মসূচির কিশোর-কিশোরী ক্লাবে

সিদীপের কৈশোর কর্মসূচির কিশোর ও কিশোরী ক্লাবগুলোতেও শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে আলাদা ব্যানারে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এসব আলোচনাসভায় ক্লাবের কিশোর-কিশোরীরা শেখ রাসেলের জীবনের ওপর আলোচনা করে। ■

মানিকগঞ্জ জেলা

নারায়ণগঞ্জ জেলা

‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’
শীর্ষক রচনা-গল্প-কবিতা প্রতিযোগিতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিদীপ পরিবারের সকল সদস্যের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক রচনা, গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা। ৮ নভেম্বর ২০২১ বিকেল সাড়ে তিনটায় সিদীপ ভবনের সম্মেলনকক্ষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মী এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। আলমগীর খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া। প্রথমেই সভাপতি তার স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এরপর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা, পরিচালক (ফিন্যান্স অ্যান্ড অপারেশন্স) জনাব এস এ আহাদ এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি। রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন পুবাইল শাখার শিক্ষা সুপারভাইজার বিউটি ইয়াসমিন, গল্পে মদনপুর-২ শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. শাহপরান চৌধুরী এবং কবিতায় জামশা শাখার ফিল্ড অফিসার মনসুর আলম মিন্টু। পুরস্কার বিতরণ শেষে বঙ্গবন্ধুর ওপর রচিত কবিতা

আবৃত্তি করেন মিঠুন দেব এবং মনজুর শামস। পুরস্কারপ্রাপ্ত বিউটি ইয়াসমিন একটি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি শেষ হয় প্রধান কার্যালয়ের নূরুন্নাহার নিশি, আফরিন হোসেন ফারিতা, জাহিদুল ইসলাম পলাশ ও মিঠুন দেবের পরিবেশনায় ‘শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি’ গানটির মাধ্যমে। ■

সিদীপে বিজয়োৎসব–

মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সিদীপ বিজয়োৎসব-২০২১ উদযাপন করে। বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে সিদীপ প্রধান কার্যালয় আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। প্রধান কার্যালয়সহ সকল ব্রাঞ্চ কার্যালয়ে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বিজয়োৎসব-২০২১এর ব্যানার ঝুলানো হয়। প্রধান কার্যালয়ের গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে এ উপলক্ষে একটি আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক, বিভিন্ন কর্মসূচির পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপকসহ প্রধান কার্যালয়ের অন্য সকল কর্মী।

সকলে মিলে কেক কেটে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা বলেন, আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি, আজকের বিজয় দিবস বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তির একটি চূড়ান্ত দিন। অন্যদের মধ্যে আলোচনা করেন পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) এস. আবদুল আহাদ।

শপথ গ্রহণ

-২০২১

অনুষ্ঠানের সভাপতি সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান মুক্তিসংগ্রামী ও যোদ্ধা শাহজাহান ভুঁইয়া তার আলোচনায় বলেন: "বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে আমরা দুটি দিবস পালন করি–একটি ২৬শে মার্চ ও অন্যটি ১৬ই ডিসেম্বর। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন–এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ২৬শে মার্চে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণায় যুদ্ধ শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বরে আমরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে হারিয়ে বিজয় অর্জন ও বাংলাদেশকে মুক্ত করেছি। এই বিজয় দিনে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেড়ে গেছে। সর্বসাধারণের অসমাপ্ত মুক্তির সংগ্রামে অন্যদের সাথে আমরা উন্নয়নকর্মীরাও লিপ্ত রয়েছি।

"মানবোন্নয়নের মাধ্যমে আমরা বঞ্চিত মানুষের সক্ষমতা বাড়িয়ে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে আনার জন্যে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছি। সিদীপ অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাসহ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সফল হবে ইনশাল্লাহ।"

এতে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম পলাশ, নূরুন্নাহার নিশি ও রবিউল আলম শরিফ। 'তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে' মিলিতকণ্ঠে গেয়ে শোনান মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম পলাশ, নূরুন্নাহার নিশি, আফরিন হোসেন ফারিতা, শারমিন সুলতানা, জাহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী ও রূপম মজুমদার। রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর কবিতা 'বাতাসে লাশের গন্ধ' ও শামসুর রাহমানের কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' আবৃত্তি করেন যথাক্রমে মিঠুন দেব ও আলমগীর খান। বিজয়োৎসব-২০২১এর আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন সংস্থার গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান। ■

ব্রাঞ্চ পর্যায়ে বিজয়োৎসব-২০২১ উদ্‌যাপন

পঞ্চাশের বাংলাদেশ

বিশ্বের এক বিস্ময়

অলোক আচার্য

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্মমতা শুরু হয় নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। নিষ্পেষণ, নির্যাতন, জুলুম, ধর্ষণ আর লুটপাটের বিভীষিকাময় অবস্থায় দীর্ঘ নয় মাস পর এই ডিসেম্বরেই বাঙালির চূড়ান্ত বিজয় আসে। পৃথিবীর বুকে একটি নতুন দেশের জন্ম হয়। স্বাধীনতার ৫০ বছরে দাঁড়িয়ে আমাদের ভাবার সময় এসেছে দেশকে আমরা কতদূর আনতে পেরেছি।

গত এক দশকে উন্নয়নের সব সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী। মাথাপিছু আয়, রিজার্ভ, গড় আয়ু, প্রবৃদ্ধি সবকিছুই সমৃদ্ধ। পাশাপাশি কিছু সামাজিক প্রতিবন্ধকতা আমাদের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। অর্থনীতি, শিক্ষা, কৃষি, তথ্য-প্রযুক্তি, অবকাঠামো খাতে দেশ অগ্রসরমান। ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ফাইভ-জি-র যুগে প্রবেশ করেছে। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের পর এবার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণের অপেক্ষায় রয়েছি আমরা। স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশের কৃষি ও উৎপাদন ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে। জানা যায়, বর্তমানে দেশের শ্রমশক্তির ৪০ দশমিক ৬ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত। স্বাধীনতার শতবর্ষে আমরা কী চাই?

একটি দুর্নীতিমুক্ত দেশ। ঘুষ, কালো টাকা, ভেজাল, প্রতারণা এখন সমাজের সর্বত্র চষে বেড়াচ্ছে। যে স্বাধীনতা ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে সেই স্বাধীনতার স্বাদ সবাই সমানভাবে পাবে না তা হয় না। দেশ যদি উন্নত হয়, দুর্নীতিমুক্ত হয়, অর্থনীতি গতিশীল হয় তাহলে লাভ আমাদেরই। আমরাই তার সুবিধা ভোগ করবো। এই যে পদ্মা সেতু আমরা ব্যবহার করবো তার সুফল ভোগ করবে দেশের সব নাগরিক। দেশের অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসবে, মানুষের জীবনযাত্রা পাল্টাতেও ভূমিকা রাখবে। গতি আসবে মানুষের জীবনে। আমরা বিশ্ব দরবারে নিজেদের সামর্থ্য, প্রত্যয় জানান দিয়েছি।

চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন না থাকলে আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেতাম না। আর সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন বাঙালির চোখে এঁকে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের করণীয় কী? বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল একটা দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া। অসাম্প্রদায়িক চেতনা গড়া। একটা বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। সবার মুখে অন্নের যোগান নিশ্চিত করা।

চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন না থাকলে আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেতাম না। আর সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন বাঙালির চোখে এঁকে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের করণীয় কী? বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল একটা দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া। অসাম্প্রদায়িক চেতনা গড়া। একটা বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। সবার মুখে অন্নের যোগান নিশ্চিত করা

ভালো হয় যদি এমন কোন ব্যবস্থা করা যায় যাতে আমাদের কচিকাঁচা ছেলেমেয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের মুখ থেকে তাদের বীরত্বের কাহিনী শুনতে পায়। অন্তত সপ্তাহে একদিন যদি তারা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা শুনতে পায় তাহলে ছাত্রছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধকে নতুনভাবে জানতে পারবে। বইয়ে পড়া ঘটনা অন্তরে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কিন্তু যদি কেউ গল্পের মাধ্যমে সেই ঘটনাগুলোকে বর্ণনা করে আর সেই মানুষটি যদি হয় সেই ঘটনার সমসাময়িক তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হবে সন্দেহ নেই। এটা ছাত্রছাত্রীর বিদ্যালয়ে অবনস্থানকালীনও হতে পারে আবার নির্দিষ্ট এলাকায়ও হতে পারে বা অন্যকোন নির্ধারিত স্থানে।

ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণের নাম বাংলাদেশ। সেই আদিকাল থেকেই এদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান পাশাপাশি হাত ধরে বসবাস করে আসছে। তবুও মাঝে মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হামলা-নির্যাতন আমাদের স্তব্ধ করে দেয়। এদেশে তো এসব হওয়ার কথা ছিল না। স্বাধীনতার পর থেকেও একই পতাকার নিচে আমরা সবাই আজ বসবাস করছি। আমরা চাই না এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ঘিরে ফেলুক। সব ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারে। স্বাধীনতার এটাও উদ্দেশ্য।

আজ পত্রপত্রিকার পাতা খুললেই দেশের ছোটবড় অনেক দুর্নীতিবাজদের খবর আমরা দেখি। তারা নিজেদেরকে কলঙ্কিত করার সাথে সাথে দেশকেও পিছিয়ে দিচ্ছে। দুর্নীতি এক ভয়ানক ব্যাধি যা ছড়িয়ে আছে সর্বস্তরে। এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সেই চর্চা শুরু করতে হবে পরিবার থেকে। মিথ্যাকে মিথ্যা এবং সত্যকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বইয়ের পাতায় নীতিকথা থেকে কোনো লাভ নেই। তা বাস্তব জীবনে চর্চা করতে হবে। আমরা শিশুদের শেখাচ্ছি মিথ্যা বলা মহাপাপ। বইয়ের পাতায়ও সেটাই লেখা আছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে সত্য হচ্ছে, মিথ্যার চর্চা হচ্ছে খোদ পরিবারেই। এই তালিকায় সবাই রয়েছে। শিশু শিখছে মিথ্যা বললে অনেক সমস্যা থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। আমরা সেটা তাদের শেখাচ্ছি! এই ধরনের নীতিকথা বইয়ের পাতায় থেকে তাই লাভ নেই। লাভ হবে যদি আমরা নৈতিকতা চর্চা করি। নিজে করার সাথে সাথে বাড়ির শিশুদের তা চর্চায় আগ্রহ সৃষ্টি করি। দেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সবাইকে সৎ ও পরিশ্রমী হতে হবে। এছাড়া স্বাধীনতার স্বপ্ন অধরা থেকে যাবে।

উন্নয়ন ও সামাজিক শৃঙ্খলা একে অপরের পরিপূরক। আজ আমাদের যে অগ্রগতি তা এক রূপকথা। যে পাকিস্তান আমাদের থামাতে চেয়েছিল তারাও আমাদের পেছনে। কিছু ঘটনা রয়েছে যা আমাদের উন্নয়নের গতি শ্লথ করে। এসব সত্ত্বেও বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। আমরা একটি দেশ চাই যেখানে সবাই একসাথে দেশের জন্য স্বপ্ন দেখবো। দেশকে এগিয়ে নিলে নিজেকেও এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। ১০০ বছরের বাংলাদেশ হবে সবদিক থেকে উন্নত। যেখানে কোনো সামাজিক বিশৃঙ্খলা থাকবে না। সবার জন্য নিরাপদ হবে সমাজ। ■

লেখক: শিক্ষক ও মুক্তগদ্য লেখক

ফিরে পেতে চাই

মনসুর আলম মিন্টু

ঘুম দিয়েছে ছুটি আকাশের তারা গুণতে
ঝিঁঝি পোকার তালে বিরহী গান গাইতে।
আসে না কাছে বসে না চোখে দূরে চলে যায়
বিছানায় শুয়ে একাকী রাতের প্রহর গোণা হয়।
মোরগের ডাক প্রহরে প্রহরে বেজে ওঠে কানে
চাঁদের আলোয় খেলা করে তারারা গগনে।
শেয়াল, কুকুর, পাখপাখালি বিভোর ঘুমে মত্ত
ঘুমহীন চোখ যেনো জমাটবাঁধা রক্ত।
জেগে থাকা রাত হয় না তো শেষ ডাকে না ভোরের পাখি
অযথাই যেনো ভাবনা ভেবে জেগে থাকে দুটি আঁখি।
আসে না ঘুম চোখের পাতায়, কাটে তো জেগে রাত
একা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুরি শত কাত।
নিয়েছে ছুটি ঘুমগুলো যেনো বিরহ ব্যাথা দিয়ে
স্বপ্ন দেখার আঁখি দুটি মোর থাকে শুধু চেয়ে।

• কবি: ফিল্ড অফিসার, জিরানী ব্রাঞ্চ, আশুলিয়া এরিয়া, সিদীপ

আমার দাদু শহীদ বুদ্ধিজীবী
দীনেশ চন্দ্র রায় মৌলিক

দীপ কুমার রায় মৌলিক

ঢাকা থেকে মাইল বিশেক দূরে বংশী নদী। হিন্দু-মুসলিম ও বৌদ্ধ ধর্মের ধারক ও বাহক একটি স্নিগ্ধ মনোরম জনপদ ধামরাই ।

সেই ধামরাইও বাদ পড়লো না। ১৯৭১ সনের ৯ই এপ্রিল মধ্যাহ্নে একদল পাকিস্তানি হানাদার অতর্কিতে গ্রামটিকে ঘিরে ফেললো। প্রায় একুশ জন অসহায় নিরস্ত্র মানুষকে বেঁধে হানাদার বাহিনী ধামরাই থানায় নিয়ে গেল। সেখানে তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন করার পর সকলকে তারা গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল মাইল তিনেক দূরে কালামপুর নদী সংলগ্ন একটি ছোট খালের পাড়ে। সেখানে সারিবদ্ধভাবে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলিতে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। একুশ জনের মধ্যে আহত অবস্থায় চারজন বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু বাঁচতে পারেনি বাকি সতের জন। আর ঐ সতেরটি লাশের মধ্যেই ছিলেন আমার দাদু দীনেশ চন্দ্র রায় মৌলিক ও আমার কাকা অরুণ কুমার রায় মৌলিক ওরফে হাবুল। তাদের একটা বড় অপরাধ ছিল তারা সকলেই এ দেশটাকে বড় বেশি ভালবাসতো।

আমার দাদু ছিলেন উকিল। কিন্তু মিথ্যা এবং অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করতে পারেননি বলে তিনি ওকালতি পেশা ত্যাগ করে স্থানীয় হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে সামান্য বেতনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষকতা করে গেছেন। বিদ্যাবুদ্ধি, ন্যায়নীতি, আদর্শ ও পাণ্ডিত্যে তিনি গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান সকলের নিকট ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার মানুষ। গ্রামের নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট তিনি ছিলেন পবিত্র মানুষ। যে কোন সময় যে কোন কাজে, বিপদে-আপদে এবং জমি সংক্রান্ত জটিলতায় তারা তাদের প্রাণপ্রিয় উকিল বাবুর কাছে ছুটে আসতো। আমি আমার বাবার কাছে শুনেছি, কত উৎসাহ নিয়ে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরলসভাবে বিনা পারিশ্রমিকে বুদ্ধি, যুক্তি ও পরামর্শ দিয়ে তাদের যে কোন কাজ তিনি সমাধান করে দিয়েছেন। দাদুর মৃত্যু সংবাদ শুনে অনেকেই স্বজন হারানোর বেদনায় কেঁদেছেন।

আমার দাদু ছিলেন আমার কাছে আদর্শ পুরুষ। আমার অহংকার, আমার গর্ব। সারা জীবন তিনি সত্য পথে থেকেছেন। মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেননি। অনেকের মুখেই শুনেছি, সত্য ভাষণের জন্যই তিনি মরেছেন। অকপটে মিলিটারির নিকট তিনি নিজের শিক্ষা-দীক্ষা, পেশা সমস্ত প্রকাশ করেছেন। আর সেটাই হল তার কাল। মৃত্যুর

আমার দাদু ছিলেন উকিল। কিন্তু মিথ্যা এবং অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করতে পারেননি বলে তিনি ওকালতি পেশা ত্যাগ করে স্থানীয় হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে সামান্য বেতনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষকতা করে গেছেন

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি মিথ্যা বলেননি। বলতে পারেননি। দাদুকে ছাড়িয়ে আনার জন্য আমার কাকা থানায় গিয়েছিল। কিন্তু তিনিও আর ফিরতে পারেননি।

দেশ স্বাধীন হবার পর শহীদ দীনেশ চন্দ্র রায় মৌলিক শহীদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করেন। প্রতি বছর সরকারিভাবে উদযাপিত স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে শহীদ বুদ্ধিজীবী দীনেশ চন্দ্র রায় মৌলিকের অবদান ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান করা হয়। ধামরাই উপজেলার একটি ভবনের নামকরণ আমার দাদুর নামে হয়েছে ।

এই বছর আমার সৌভাগ্য হয়েছে দাদুর অবদান ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত সম্মাননা গ্রহণ করার। আর আমার সারাজীবনের দুর্ভাগ্য উনার মত একজন মানুষের সঙ্গ না পাওয়া। ছোটবেলা থেকেই ইংরেজির জাহাজের নাতি বলেই পরিচিতি পেয়ে গেলাম। ■

সূত্র: ১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৮ম খণ্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা। ২। স্মৃতি ১৯৭১, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বাংলা একাডেমী)। ৩। শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ। ৪। ঢাকা ১৯৭১: ধামরাই গণহত্যা।

লেখক: এজিএম (আইটি), সিদীপ

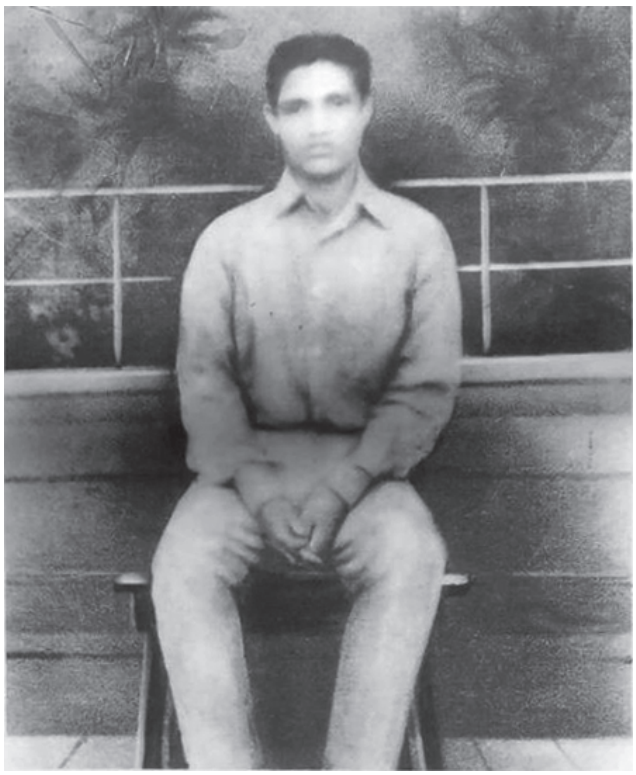

লেখক (ছবিতে বামে) শহীদ দাদুর পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করছেন। সম্মাননা দিচ্ছেন (লেখকের বাম থেকে) ধামরাইয়ের থানা ইনচার্জ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা চেয়ারম্যান।

লালমনিরহাটের শহীদ বুদ্ধিজীবী
মোস্তাফা হাসান আহমেদ

শিশির মল্লিক

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এবারের শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ছিল বিশেষ তাৎপর্যময়। ১৯৭১এর ২৫ মার্চ রাতে হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদারদের পরিকল্পিত 'অপারেশন সার্চলাইট' ছিল পুরো বাঙ্গালি জাতিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার মিশন। শুরু থেকেই প্রধান টার্গেট ছিল শিক্ষিত তরুণ ও বুদ্ধিজীবী অংশকে নির্মূল করা। যুদ্ধের শুরুতেই ৫ এপ্রিল ১৯৭১এ পাকিস্তানি সেনাবাহিনির নেতৃত্বে তৎকালীন মহকুমা শহর লালমনিরহাটে স্থানীয় রাজাকার ও বিহারি জনগোষ্ঠীর সহায়তায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়। প্রায় শ' খানেক লোককে ধরে এনে রেলওয়ে স্টেশনের পাশে নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে তারা। যার স্মৃতিস্তম্ভ এখন সেই দুঃসহ স্মৃতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শহরের সাপটানা এলাকায় বাস করতেন স্থানীয় রেলওয়ে সিপি স্কুলের শিক্ষক মোস্তাফা হাসান আহমেদ। জন্মসূত্রে তিনি লাকসামের ফেনুয়া অঞ্চলের মোল্লা বাড়ির সন্তান। জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩১ সালে। পিতার ইচ্ছায় তিনি আলিপুর দুয়ারের ম্যাকউইলিয়াম স্কুলে ভর্তি হন ইংরেজি শিক্ষালাভের প্রয়াসে। এখান থেকে তিনি মেট্রিকুলেশন (বর্তমান এসএসসি) পাশ করেন। দেশবিভাগের পর লালমনিরহাট শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পর তিনি পাবলিক সার্ভিসে যোগ দেন। তৎকালীন আরসিও (রেভিনিউ সার্কেল অফিসার) পদে দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি চাকরি ছেড়ে তিনি পরবর্তীতে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন কালিগঞ্জ থানাধীন কাকিনা ইউনিয়নে জন্মগ্রহণকারী খ্যাতিমান কবি ফজলল করিমের পরবর্তী বংশধরদের সন্তান সেলিমা আহমেদের সঙ্গে। তিনিও লালমনিরহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন যাকে সবাই বড় আপা নামে চিনতেন।

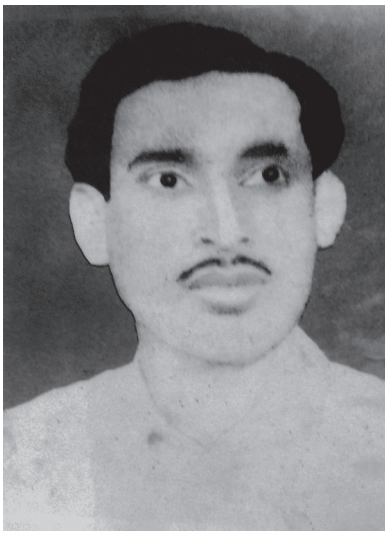

৫ এপ্রিল থেকে শহরে হত্যা ও ধ্বংসলীলা শুরু হয়। ১৯ এপ্রিল সকালে মোস্তাফা হাসান আহমেদ বাড়ির উঠানে বসে ছাগলকে পাতা খাওয়াচ্ছিলেন। সদ্য নবজাত কন্যাকে নিয়ে স্ত্রী সেলিমা আহমেদ ঘরে ছিলেন। এমন সময় বেশ কিছু সশস্ত্র উর্দুভাষী লোকজন এসে তাদের ঘিরে ফেলে। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা ভাষা হারিয়ে ফেলেন। একদল স্ত্রী-কন্যাকে ঘিরে ধরে। আরেক দল মোস্তাফা হাসানকে ঘিরে ধরে এবং তাকে মেজর সাহেব ডেকেছে বলে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। কারো কারো সাক্ষ্য মতে বর্তমান লালমনিরহাট জেলা হাইস্কুলের পিছনে আরো অনেকের সাথে তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাঁর কোন লাশ পরিবার খুঁজে পায়নি।

সেসময়কার ৮ দিনের শিশুকন্যা নাজনীন সাথী বাবা নামক একটি ছবি ও মা-ভাইবোন ও স্বজনের কাছে শোনা টুকরো টুকরো কিছু ঘটনার ছবি মনে এঁকে বেড়ে উঠেছেন। আর শহীদ দিবস এলে বাবাকে উদ্দেশ্য করে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন। অন্যদিকে শিক্ষিকা সেলিমা আহমেদ পাঁচ সন্তান নিয়ে প্রতিকূল পরিবেশে একা লড়ে গেছেন। পঞ্চাশে এসে হঠাৎ স্ট্রোক করে শারীরিকভাবে অচল হয়ে পড়েন। ২০০০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। জীবিত অবস্থায় শহীদ পরিবার হিসেবে কোন ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ নেননি। তাঁর লড়াইকে একটি প্রতীক হিসেবে দেখলে প্রায় বেশিরভাগ শহীদ পরিবারের সংগ্রামের একটি মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে শহীদ দিবসের তাৎপর্য জানতে চাইলে তাঁদের কন্যা নাজনীন সাথী বলেন: 'আমাদের বাবার কবর নেই কিন্তু অনুভব করি পুরো বাংলাদেশ জুড়ে রয়েছে তার কবর। পুরো দেশ কি শহীদদের কবরস্থান নয়?'

সত্যি তাই। ৭১এ মুক্তিযুদ্ধে দেশ শহীদদের রক্তে স্নাত হয়েছে, সারা দেশ ভরে উঠেছিল লাশ আর লাশে। সেই দুঃসহ স্মৃতি যারা বহন করেন তাদের কাছে পাকিস্তানি জান্তারা কখোনোই ক্ষমা পাবে না। যে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙ্গালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ও গর্জে উঠেছিল তার ফলশ্রুতিতেই আমরা পেয়েছি আজকের এই বাংলাদেশ।

শহীদ বুদ্ধিজীবী মোস্তাফা হাসান আহমেদের কন্যা গল্পকার নাজনীন সাথী বলেন, 'দেশকে ভালোবাসার মতো সুখ ও মর্যাদা আর কিছুতে হতে পারে না।' ■

৯ ডিসেম্বর ২০২১ আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে দুর্নীতি দমন কমিশন আয়োজিত মানববন্ধনে ঢাকার খামারবাড়িতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামনে সকাল সাড়ে ৯টায় পিকেএসএফের নেতৃত্বে সিদীপ কর্মীদের অংশগ্রহণ।

সিদীপের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর জনাব নূরুন নবী সেখ তার অবসর গ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ বিকালে সংস্থার গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে চাকুরি জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন ও মাঠ পর্যায়ে সহকর্মীদেরকে দক্ষতা, সৌহার্দ্য ও নৈতিকতার সঙ্গে কাজ করে সংস্থাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রেরণা দেন।

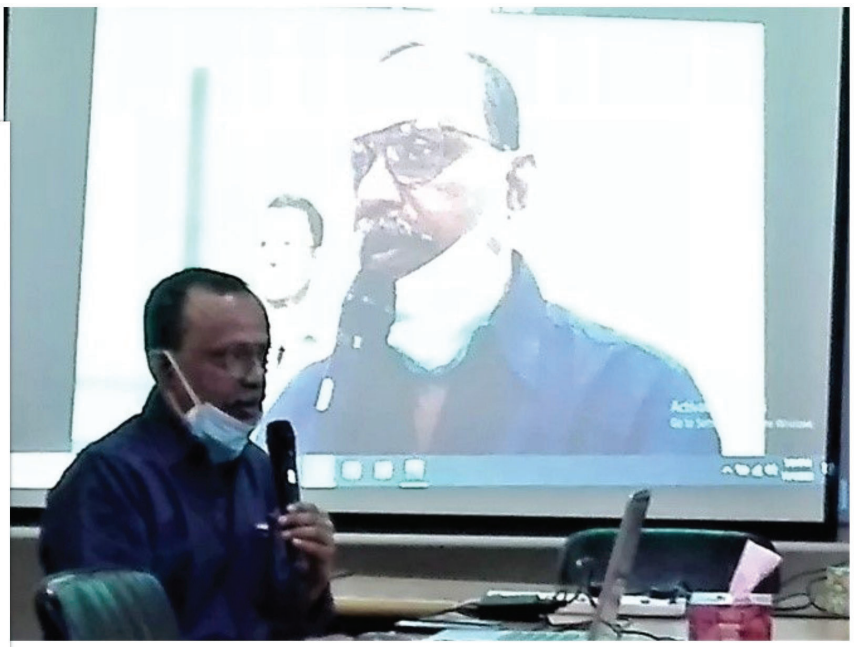

‘উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া’

বইয়ের ওপর আলোচনা

সিদীপ ভবনের সম্মেলনকক্ষে ৪ নভেম্বর ২০২১ বিকেল সাড়ে তিনটায় ‘উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া’ গ্রন্থের ওপর এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অনলাইনে অংশ নেন সিদীপ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি। অনলাইনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যোগ দেন সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক প্রয়াত মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও লেখক আশরাফ আহমেদ। সভাটি সঞ্চালন করেন আলমগীর খান। গ্রন্থটির ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন আশরাফ আহমেদ, লেখক ও উন্নয়নকর্মী মাহফুজ সালাম, শিল্পী শিশির মল্লিক এবং লেখক ও নাট্যকর্মী সিরাজুদ দাহার খান। সিদীপ পরিবারের পক্ষ থেকে গ্রন্থটির ওপর আলোকপাত করেন মাহমুদা আক্তার, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মিঠুন দেব ও মনজুর শামস। আলোচকগণ গ্রন্থটির ওপর আলোচনা ছাড়াও মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার জীবন ও কর্মের ওপরও আলোকপাত করেন। তারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে তার জীবন ও কর্মের ওপর আরো গবেষণা হলে তা বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া সভাপতি হিসেবে প্রাণবন্ত আলোচনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ■

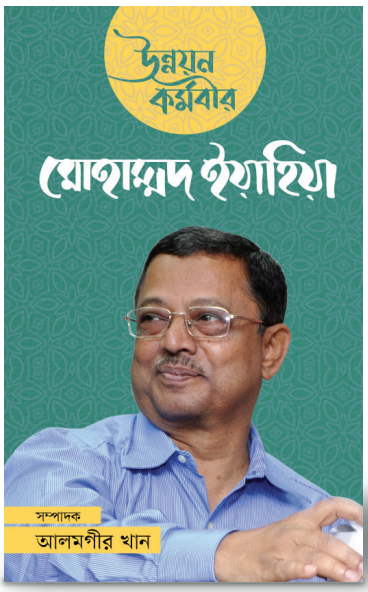

‘আমাদের শিক্ষা : নানা চোখে’

গ্রন্থের ওপর রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদরেকে পুরস্কার প্রদান ও শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও গবেষণা কর্মকর্তা আলমগীর খান সম্পাদিত ‘আমাদের শিক্ষা : নানা চোখে’ গ্রন্থটির ওপর এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষা সুপারভাইজারদের ভেতর। ১১ নভেম্বর ২০২১ সিদীপ সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন আলমগীর খান এবং সভাপতিত্ব করেন সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া। শুরুতেই সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মরহুম মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সভাপতি স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তার বক্তব্য শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা, পরিচালক (ফিন্যান্স অ্যান্ড অপারেশন্স) এস এ আহাদ, পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম) এ কে এম হাবিব উল্লাহ আজাদ, অতিরিক্ত পরিচালক (স্পেশাল প্রোগ্রাম) আবদুল কাদির সরকারসহ সিদীপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। পুরস্কার বিতরণ শেষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিবগঞ্জ শাখার শিক্ষা সুপারভাইজার কিসমোতারা খাতুন, হায়দ্রাবাদ শাখার শিক্ষা সুপারভাইজার মাহমুদা আক্তার এবং বারেরা শাখার শিক্ষা সুপারভাইজার মোরশিদা আক্তার। এরপর কবিতা আবৃত্তি করেন প্রধান কার্যালয়ের শারমিন সুলতানা। সবশেষে দলীয় সংগীত পরিবেশন করেন প্রধান কার্যালয়ের জাহিদুল ইসলাম পলাশ, নূরুন্নাহার নিশি, শারমিন সুলতানা ও মিঠুন দেব। ■

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার ৭১তম জন্মবার্ষিকী

১ ডিসেম্বর ২০২১ সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার ৭১তম জন্মবার্ষিকীতে সিদীপ সভাকক্ষে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা, পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) জনাব এস. আবদুল আহাদ, পরিচালক (প্রোগ্রাম) জনাব এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদসহ প্রধান কার্যালয়ের কর্মীগণ। এতে আলোচনা করেন সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির ডিজিএম ডা. এ. কে. এম. আব্দুল কাইয়ুম। মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার কবিতার বই 'কষ্ট ও তার অতল ধ্বনি' থেকে কবিতা পড়ে শোনান সংস্থার গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা মনজুর শামস ও এমআইএস ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা মিঠুন দেব। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষালোক-এর নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। ■

সেরা করদাতা হিসেবে সিদীপের সম্মাননা লাভ

২৪ নভেম্বর ২০২১ রাজধানীর বেইলি রোডের অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সেরা করদাতা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও তাদের প্রতিনিধিদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি। সিদীপের পক্ষ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা। এনজিওদের মধ্যে আশা ও বুরো বাংলাদেশও এ সম্মাননা লাভ করেছে।

১০ম সোশ্যাল বিজনেস অ্যাকাডেমিয়া কনফারেন্সে সিদীপের গবেষণাপত্র উপস্থাপন

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে ৪-৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক '১০ম সোশ্যাল বিজনেস অ্যাকাডেমিয়া কনফারেন্স ২০২১'। কোভিড-১৯এর কারণে এবার সম্মেলনটি অনলাইনে হয়। এতে ৫ নভেম্বর উপস্থাপিত হয় শাহজাহান ভূঁইয়া, মিফতা নাঈম হুদা ও আলমগীর খান কর্তৃক যৌথভাবে রচিত গবেষণাপত্র: Sustainable Health Care Services for the Rural Disadvantaged and Excluded। স্টাডি পেপারটি উপস্থাপন করেন সিদীপের ভাইসচেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া। সেশনটিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। এটি সঞ্চালন করেন Glasgow Caledonian University-র Dr. Olga Biosca।

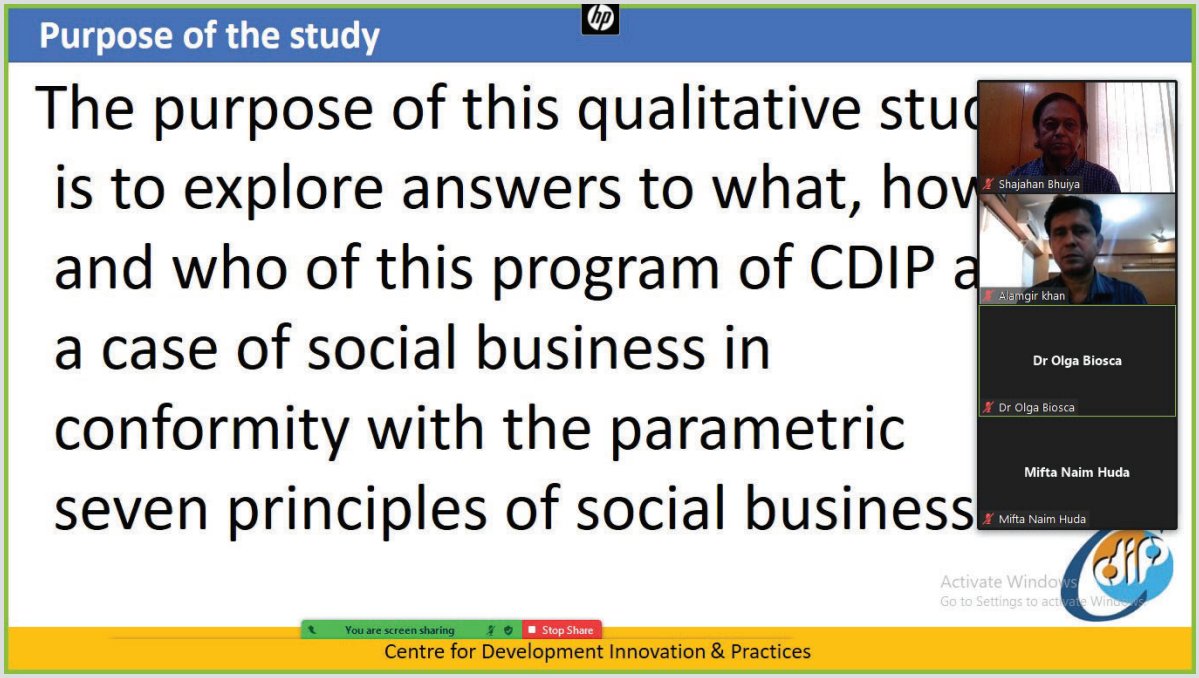

‘করোনা-দুর্যোগকালে প্রায় হাজার খানেক সিদীপ-কর্মী করোনায় আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে সংস্থা অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে, আমাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির কর্মীরা যেভাবে কাজ করেছে তা প্রশংসনীয়। স্কুল বন্ধ থাকা অবস্থায় সিদীপ শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদের বাড়িবাড়ি গিয়ে যোগাযোগ করেছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা করেছেন এটাকেতো অ্যাপ্রিশিয়েট করতেই হয়’

সিদীপের ২৬তম

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ সন্ধ্যায় সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় সংস্থার ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা। প্রধান কার্যালয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সাধারণ সভা শুরু হয়। সাধারণ পরিষদের যে সদস্যগণ সশরীরে সভায় অংশ নিতে পারেননি তারা ‘জুম’-এর মাধ্যমে অংশ নেন।

মূল সভার কার্যক্রম শুরুর আগে সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, আশা ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা মো. সফিকুল হক চৌধুরী, সিদীপ সাধারণ পরিষদের সদস্য এ. এফ. এম. শামসুদ্দীন, সিদীপ সাধারণ পরিষদের সদস্য নার্গিস ইসলামের স্বামী সিরাজুল ইসলামের এবং সিদীপ পরিবারের অন্যান্য প্রয়াত সদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তাঁদের আত্মার মাগফেরাত ও বর্তমানে সিদীপ পরিবারের অসুস্থ সদস্যদের আরোগ্য কামনা করে সভায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

সিদীপ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ফজলুল বারি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে সিদীপের ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু করেন। তিনি নির্বাহী পরিচালককে সভা পরিচালনা করার আহ্বান জানালে এজেন্ডা অনুযায়ী আলোচনা শুরু হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভা

সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার (ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) জনাব এ. কে. এম. শামসুর রহমান ২০২০-২১এর সংশোধিত বাজেট উত্থাপনকালে উল্লেখ করেন, নতুন শাখা চালু হয়েছে ১০টি, নতুন সমিতি গঠিত হয়েছে ৪০৭টি, নতুন সমিতি-সদস্য ৮,২৪৯ জন এবং ট্যাক্স পরিশোধের পর নেট সারপ্লাস ১২%।

এরপর নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা সিদীপের সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি, সমৃদ্ধি, জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।

সাধারণ পর্ষদের সদস্য জনাব খায়রুল কবীর বলেন, করোনা-দুর্যোগকালেও সিদীপ-কর্মীদের যে ডেডিকেশন, প্রায় হাজার খানেক সিদীপ-কর্মী করোনায় আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে সংস্থা অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে, আমাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির কর্মীরা যেভাবে কাজ করেছে তা প্রশংসনীয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "স্কুল বন্ধ থাকা অবস্থায় সিদীপ শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদের বাড়িবাড়ি গিয়ে যোগাযোগ করেছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা করেছেন এটাকেতো অ্যাপ্রিশিয়েট করতেই হয়।" এরপর তিনি প্রয়াত নির্বাহী পরিচালককে নিয়ে প্রকাশিত "উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া" বইটির প্রশংসা করেন এবং এ প্রকাশনার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

সংস্থার পরিচালনা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এবং বর্তমান সাধারণ পরিষদের সদস্য জনাব আব্বাস ভূঁইয়া তার বক্তব্যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহে সিদীপের গবেষণা-প্রবন্ধসমূহ গৃহীত

কোভিড-১৯এর জন্য আগামী দিনগুলিতে যে চ্যালেঞ্জ আসছে তা মোকাবেলায় গরিব ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে পড়ছে কারণ ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের ক্ষমতা সবার থাকে না। সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে প্রিভেন্টিভ কেয়ারের যে কম্পোনেন্ট আছে তা ব্যবহার করে আমরা কাজ করতে পারি

ও উপস্থাপিত হওয়ার বিষয়ে প্রশংসা করেন এবং এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন।

জনাব শফিকুল ইসলাম দেশের বাইরের একজন শিক্ষিকার উদাহরণ দিয়ে বলেন, সিদীপের শিক্ষা কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের বাড়িবাড়ি গিয়ে পড়াশোনার খোঁজখবর নেয়া ও নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করে শিক্ষার্থীদেরকে মেইনস্ট্রিমে রাখার প্রয়াস অন্তর্ভুক্তির কথা ভাবতে হবে।

সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া বলেন, আমাদের শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশহণকারীদের মধ্যে যারা গ্রেড-১, গ্রেড-২ ও প্রি-গ্রেড-১এ অর্থাৎ যাদের বয়স ৮ বছর পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ইসিডি) করলে আমাদের শিক্ষা কর্মসূচিতে এক নতুন মাত্রা যোগ হবে। তিনি আরও বলেন, কোভিড-১৯এর জন্য আগামী দিনগুলিতে যে চ্যালেঞ্জ আসছে তা মোকাবেলায় গরিব ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে পড়ছে কারণ ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের ক্ষমতা সবার থাকে না। সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে প্রিভেন্টিভ কেয়ারের যে কম্পোনেন্ট আছে তা ব্যবহার করে আমরা কাজ করতে পারি। টেকনোলজির দিকে নজর দেয়া এবং টেকনোলজিকে ব্যবহারের মাধ্যমে গরিব জনগোষ্ঠীর লাইভলিহুড প্রোমোট করার কথা বলেন তিনি।

সাধারণ সভায় এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না, জনাব শামা আলম ও অন্যরা। সবশেষে সংস্থার চেয়ারম্যান সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ■

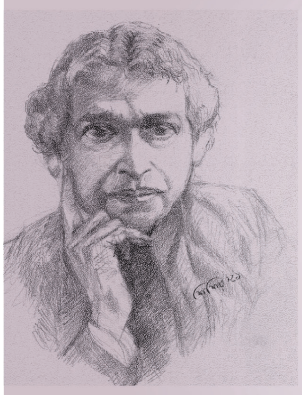

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে

আলোচনা

জগদীশচন্দ্র বসুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার আধুনিক ফল
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক

০৩ ডিসেম্বর, ২০২১
শুক্রবার,বিকাল ৪.৩০ মি.

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি শিক্ষালোক

বিজ্ঞানি জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা

বাঙালি বিজ্ঞানিদের মধ্যে যিনি সকলের প্রিয় তিনি বাংলাদেশের বিক্রমপুরে (বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ) রাঢ়িখালের বিজ্ঞানি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। পুরো ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার তিনি পথিকৃৎ। তাঁর জন্ম ময়মনসিংহে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ালেখা ফরিদপুরে। পরে কোলকাতা হয়ে কেমব্রিজে যান। পরাধীন ভারতের অন্তর্গত পশ্চাদপদ বাংলার সন্তান হওয়ায় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর হাতে তাঁকে অনেক বৈষম্যের শিকার হতে হয়। কিন্তু সকল বৈষম্যকে অতিক্রম করে তিনি জয় করে নিতে পেরেছিলেন বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা। আর ভোলেননি কখনো তাঁর মাতৃভূমি বাংলাকে। তিনি শুধুমাত্র একজন বিজ্ঞানি ছিলেন না, ছিলেন অনেক মানবিক গুণে ভাস্বর এক মহান মানুষ। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে বাংলাদেশে আমাদের এই মহান বিজ্ঞানি উল্লেখযোগ্যভাবে আলোচিত ও চর্চিত হন না। এবার জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ছোটকাগজ 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' এবং শিক্ষাবিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোক'-এর একটি যৌথ আয়োজন সেক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জগদীশচন্দ্র বসু শুধুমাত্র একজন বিজ্ঞানি ছিলেন না, ছিলেন অনেক মানবিক গুণে ভাস্বর এক মহান মানুষ। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে বাংলাদেশে আমাদের এই মহান বিজ্ঞানি উল্লেখযোগ্যভাবে আলোচিত ও চর্চিত হন না

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন ৩০ নভেম্বরকে কেন্দ্র করে 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' এবং 'শিক্ষালোক' ৩ ডিসেম্বর ২০২১ সন্ধ্যায় সিদীপ (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস) সভাকক্ষে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এতে 'জগদীশচন্দ্র বসুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার আধুনিক ফল' শীর্ষক ভিডিও-রেকর্ডেড আলোচনা উপস্থাপন করেন 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'র প্রধান সম্পাদক বিজ্ঞানি ও লেখক আশরাফ আহমেদ এবং 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক' শীর্ষক লিখিত আলোচনা উপস্থাপন করেন চিত্রশিল্পী শিশির মল্লিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লেখক-গবেষক সালেহা বেগম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'র সম্পাদক আলমগীর খান এবং নির্বাহী সম্পাদক নাজনীন সাথী।

আশরাফ আহমেদ তার ভিডিওতে রেকর্ড করে পাঠানো আলোচনায় বলেন, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের। তিনি অদৃশ্য আলোকের শক্তি পরীক্ষায় ও এ নিয়ে তাঁর গবেষণার নানা দিক বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ নিয়ে তাঁর গবেষণা পরবর্তী বিজ্ঞানিদের সাধনার মাধ্যমে আজকের মাইক্রোওয়েভ, ফাইভ-জি ও অন্যান্য আবিষ্কার নিয়ে এসেছে যার সুফল আমরা এখন ভোগ করছি। গাছের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য তিনি যেসব যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিলেন তার গুরুত্ব অপরিসীম।

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় চিত্রশিল্পী শিশির মল্লিক বলেন, আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির বহুল ব্যবহার থাকলেও বৈজ্ঞানিক চিন্তার চর্চা নেই। বিজ্ঞানকে এখানে সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়, ফলে প্রকৃত বিজ্ঞানচেতনা গড়ে ওঠে না। কোনো দেশ ও জাতি উন্নতি অর্জন করতে পারে না যদি বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির যথার্থ মেলবন্ধন তৈরি না হয়। তিনি বলেন, "জীবন হয়ে উঠুক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিময়। এ দুয়ের উপস্থিতি ব্যতীত মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীর সমতুল্য বৈ কিছু নয় বলেই আমরা মনে করি।"

জুমে আলোচনা করছেন খ্যাতিমান সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান

বিশিষ্ট লেখক-গবেষক শাহজাহান ভুঁইয়া বলেন বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরস্পর নির্ভরশীল। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। আবার নতুন প্রযুক্তি যে সাংস্কৃতিক অস্থিরতা তৈরি করে বিজ্ঞান আমাদেরকে তা থেকে মুক্তিরও পথ দেখাতে পারে।

প্রখ্যাত সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান অনলাইনে বলেন, বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে ও প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি বিজ্ঞানি জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী পালনের গুরুত্ব উল্লেখ করেন।

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা অনলাইনে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিজ্ঞানচিন্তাকে দেশের মানুষের মাঝে সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বিশিষ্ট লেখক-গবেষক শাহজাহান ভুঁইয়া বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরস্পর নির্ভরশীল। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। আবার নতুন প্রযুক্তি যে সাংস্কৃতিক অস্থিরতা তৈরি করে বিজ্ঞান আমাদেরকে তা থেকে মুক্তিরও পথ দেখাতে পারে।

'জনবিজ্ঞান' সাময়িকীর সম্পাদক আইয়ুব হোসেন বলেন, বিজ্ঞানি জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন একজন দ্রোহী মানুষ যিনি ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বেতনের বৈষম্যের প্রতিবাদে তিন বৎসর বেতন না নিয়ে কলেজে পড়িয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন জেদী মানুষ, যে কাজ ধরেছেন তা শেষ না করে ছাড়েননি। তাঁকে নিয়ে আলোচনা ও চর্চা অনেক প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কবি সৈকত হাবিব বলেন, জগধীশচন্দ্র বসু যখন বেতারযন্ত্র আবিষ্কার করেন উনি তা পেটেন্ট করেননি, কারণ তিনি মনে করেছেন

এটি কারো ব্যক্তিগত মুনাফার জিনিস নয়, বরং বিশ্ব মানবতার সম্পদ। গ্রামীণ পাঠশালায় পড়া ও বাংলার জলহাওয়ায় বেড়ে ওঠা জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর উদ্ভিদ সম্পর্কে মৌল ধারণা লাভ করেছেন ভারতীয় দর্শনের সর্বপ্রাণবাদ থেকে। দর্শনের এ বিষয়কে তিনি যে বিজ্ঞানে রূপান্তর করলেন, তা এক সাংস্কৃতিক অর্জনও।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন লেখক ও সমাজকর্মী সিরাজুদ দাহার খান, শিক্ষাসংবাদ পত্রিকার সম্পাদক দেওয়ান মামুনুর রশীদ, নবম-দশম শ্রেণির রসায়নবিদ্যার লেখক বিদ্যুৎ কুমার রায়, লেখক ফয়সাল আহমেদ ও কবি রিয়াজ মাহমুদ। জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার অংশবিশেষ আবৃত্তি করেন মিঠুন দেব।

অনুষ্ঠানের সভাপতি লেখক-গবেষক সালেহা বেগম শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের সম্পর্ক তুলে ধরেন এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে নিয়ে এ ধরনের উদ্যোগ, কার্যক্রম ও আলোচনা নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন।

লেখক, শিল্পী ও বিজ্ঞানমনস্ক বিভিন্ন মানুষের উপস্থিতিতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অন্যান্যের মধ্যে এতে উপস্থিত ছিলেন বার্ড-কুমিল্লার সাবেক পরিচালক ফজলুল বারি, কবি হানিফ রাশেদীন, কবি অনার্য নাঈম, চিত্রশিল্পী বিপ্লব দত্ত, চিত্রশিল্পী শামীম আকন্দ, সাংবাদিক ও চিত্রনির্মাতা রঞ্জন মল্লিক, বিসিএসআইআর-এর কর্মকর্তা নাহিদ জামান, লেখক তাপস বড়ুয়া, লেখক মারুফ ইসলামসহ আরো অনেকে।

> বিজ্ঞানি জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন একজন দ্রোহী মানুষ যিনি ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বেতনের বৈষম্যের প্রতিবাদে তিন বৎসর বেতন না নিয়ে কলেজে পড়িয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন জেদী মানুষ, যে কাজ ধরেছেন তা শেষ না করে ছাড়েননি

ছোটকাগজ 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' তাদের ফেব্রুয়ারি ২০২০-এর ১ম সংখ্যাটিতে প্রচ্ছদ করেছিল বিজ্ঞানি জামাল নজরুল ইসলামকে নিয়ে। ২য় সংখ্যায় তারা প্রচ্ছদ করেছে বিজ্ঞানি জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে।

'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' এবং সিদীপের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোক' যৌথভাবে ২০২১এর ফেব্রুয়ারিতে 'ভাষার লড়াই: বাংলায় জ্ঞানচর্চা' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল যেখানে তারা বলেছিল জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা মূলত মাতৃভাষায় হতে হবে এবং সেদিকটা বিবেচনা করে আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। 'জগদীশচন্দ্র বসুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার আধুনিক ফল' ও 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক' বিষয়ক এবারকার আলোচনা অনুষ্ঠানটি তাদের কার্যক্রমে আরেকটি মাত্রা যোগ করলো। ■

(ছবিতে বাম থেকে) লেখক, সাঁথিয়া থিয়েটারের দুজন নাট্যকর্মী, স্ক্রিপ্ট পড়ছেন ড. আরিফ হায়দার ও তাঁর পাশে অধ্যাপক আব্দুল দাইন সরকার

গণহত্যার ওপর রচিত নাটক

আমারে আপন করে লও

মো. তারেকুজ্জামান

১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। কারণ এ দিনেই পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলাধীন কাশিনাথপুর ইউনিয়নের পাইকরহাটি ডাব বাগানে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সাথে নায়েব সুবেদার আলী আকবরের (ইপিআর) নেতৃত্বে কিছু ইপিআর সদস্য যোগ দিয়ছিলেন। পাকবাহিনী এখানে গণহত্যার ঘটনাও ঘটিয়েছিল। পাকবাহিনীর নির্মম আক্রমণে ডাববাগানের আশেপাশের গ্রামগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধে ডাক্তার আফাজ উদ্দীন (চেয়ারম্যান), জগৎনারায়ণ বাবু, খোয়াজ শিকদার, আব্দুল লতিফ শেখ, কাজেম খাঁ, মহর, জাকের আলী শেখ, সন্তোষ, শাহজাহান, সৈয়দ আলী এবং ফরিদা নামের একটি ছোট মেয়ে পাকহানাদার বাহিনীর গণহত্যার শিকার হয়েছিল। পাকবাহিনী

‘আমারে আপন করে লও’ নাটকটি পরিবেশনের জন্য কেন পাইকরহাটী ডাববাগানকে বেছে নেয়া হলো এ প্রশ্নের উত্তরে নাটকটির রচয়িতা ড. আরিফ হায়দার বলেন,“শহর এলাকার বর্তমান প্রজন্ম গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানার সুযোগ পায়, কিন্তু মফস্বল এলাকার বর্তমান প্রজন্ম এ ব্যাপারে পিছিয়ে আছে। এ জন্যই পাইকরহাটী ডাববাগান বধ্যভূমিকে নাটকের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে”

সৈয়দপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের বিএনসিসি সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য

ডাববাগান ও এর আশেপাশের এলাকায় নির্মম অত্যাচার ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। ডাববাগানের এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী অসীম সাহসের সাথে পাকহানাদর বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বুকের গভীরে লুকিয়েছিল দেশকে স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয়। এ যুদ্ধে বেশ কিছু পাকিস্তানি সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিল। এ সম্মুখযুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ছিল এক দুঃসাহসিক অভিযান যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মহান স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ৬৪টি জেলার একটি করে বধ্যভূমিতে গণহত্যার পরিবেশ থিয়েটার নির্মাণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তারই ধারাবাহিকতায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ সন্ধ্যা ৬টায় গণহত্যা ও সম্মুখযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত পাবনার শহীদনগর ডাববাগানে শিল্পকলা একাডেমি-পাবনার পরিবেশনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আরিফ হায়দারের রচনা ও নির্দেশনায় ‘আমারে আপন করে লও’ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

অনুষ্ঠানটি শুরু হয় ডাববাগান বধ্যভূমির শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড. শামসুল হক টুকু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাবনার জেলা প্রশাসক বিশ্বাস রাসেল হোসেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাঁথিয়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম জামাল আহমেদ, সাঁথিয়া উপজেলা মুক্তি সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ, কাশিনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মীর মঞ্জুর এলাহী, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পাবনার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কালচারাল অফিসার মারুফা মঞ্জুরী খান সৌমী এবং আব্দুল রাকিবিল বারি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন গণহত্যার পরিবেশ থিয়েটার ‘আমারে আপন করে লও’-এর নির্দেশনা

(ছবিতে বাম থেকে) লেখক, জাহাঙ্গীর হোসেন ও হুমায়ূন কবির

অভিনয়শিল্পী হুমায়ুন কবীর বলেন, “বর্তমান প্রজন্মকে গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক পরিবেশ থিয়েটার প্রযোজনা ‘আমারে আপন করে লও’ একটি কার্যকরী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ”

সহকারী ও সাঁথিয়া থিয়েটারের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুদ দাইন সরকার। হজারো দর্শকের উপস্থিতিতে নাটকটি মঞ্চায়িত হয়। নাটকটি দেখে দর্শকবৃন্দ আবেগে আপ্লুত ও ব্যাথাতুর হয়ে পড়েন।

‘আমারে আপন করে লও’ নাটকটি পরিবেশনের জন্য কেন পাইকরহাটী ডাববাগানকে বেছে নেয়া হলো এ প্রশ্নের উত্তরে নাটকটির রচয়িতা ড. আরিফ হায়দার বলেন, “শহর এলাকার বর্তমান প্রজন্ম গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানার সুযোগ পায়, কিন্তু মফস্বল এলাকার বর্তমান প্রজন্ম এ ব্যাপারে পিছিয়ে আছে। এ জন্যই পাইকরহাটী ডাববাগান বধ্যভূমিকে নাটকের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে।”

এ ব্যাপারে নাটকটির নির্দেশনা সহকারী এবং সাঁথিয়া থিয়েটারের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুদ দাইন সরকার বলেন, “পাইকরহাটী ডাববাগান এমন একটি বধ্যভূমি যেখানে সম্মুখ মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার ঘটনা একই সাথে ঘটেছে যেটা পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।”

‘আমারে আপন করে লও’-এ অভিনয় করেছেন সাঁথিয়া ও কাশিনাথপুর থিয়েটারের শিল্পীবৃন্দ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার অভিনয়শিল্পীবৃন্দ। অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে আছেন: বাউল চরিত্রে হুমায়ূন কবির, মুক্তিযোদ্ধা চরিত্রে শফিকুল ইসলাম, আরিফুল ইসলাম, আব্দুস সবুর, রবিউল ইসলাম, পাক অফিসার চরিত্রে জাহাঙ্গীর হোসেন, জাহাঙ্গীর আলম সেলিম, মিজানুর রহমান ফুল, ডাক্তার আফাজ উদ্দীনের চরিত্রে ডাক্তার তোফাজ্জল হোসেন, জগৎনরায়ণ বাবুর চরিত্রে ইউনুস আলী, রাজাকার চরিত্রে আনোয়ার হোসেন, আব্দুল জলিল, বন্দী কৃষক চরিত্রে আনোয়ার হোসেন খান, নির্যাতিত কৃষক চরিত্রে রতন দাস, পাকসেনার চরিত্রে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের সদস্যবৃন্দ। ইপিআর-এর নায়েব সুবেদার আলী আকবরের চরিত্রে অভিনয় করে আমি নিজে আনন্দিত ও গর্বিত।

নাটকটিতে বাউল চরিত্রে অভিনয়শিল্পী হুমায়ুন কবীর বলেন, “বর্তমান প্রজন্মকে গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক পরিবেশ থিয়েটার প্রযোজনা ‘আমারে আপন করে লও’ একটি কার্যকরী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ।”

সারা দেশে এরূপ নাট্য উদ্যোগের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম দেশমাতৃকার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশকে মনেপ্রাণে ভালবাসবে এবং দেশকে বিশ্বদরবারে সফল, সার্থক ও অনুকরণীয় হিসেবে গড়ে তুলবে–এটাই সবার প্রত্যাশা। ■

লেখক: প্রধান শিক্ষক, ৯৪ নং শ্রীধরকুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা।

সেলিম আল দীনের নাটক ‘প্রাচ্য’

আলমগীর খান

[বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয়ের এই পঞ্চাশ বছরে নাটক গর্ব করার মত একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করতে পেরেছে। এ অর্জনের অংশ হিসেবে ‘থিয়েটাওয়ালা’ পত্রিকাটি এ সময়ে দেশের সেরা পঞ্চাশটি মঞ্চস্থ নাটক বাছাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেলিম আল দীনের লেখা ‘প্রাচ্য’ নাটকটি তার মধ্যে একটি। এ নাটকের একটি পর্যালোচনা রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত ‘থিয়েটার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ২০০০ সালে, লিখেছিলেন আলমগীর খান। থিয়েটারওয়ালা এ নাট্য-আলোচনাটি পুনঃপ্রকাশ করেছে ‘স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর : নির্বাচিত ৫০ প্রযোজনা’ শীর্ষক তাদের বিশেষ প্রকাশনায়। এ আলোচনাটি ঈষৎ পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা শিক্ষালোকে পুনর্মুদ্রণ করছি। – সম্পাদক]

নাটক: প্রাচ্য
রচনা: সেলিম আল দীন
মঞ্চপরিকল্পনা ও নির্দেশনা: নাসির উদ্দিন ইউসুফ
আলোকপরিকল্পনা: ইশরাত নিশাত ও জহিরুল ইসলাম রিপন
পোশাক ও আবহসংগীতপরিকল্পনা: শিমূল ইউসুফ
পোস্টার ডিজাইন: আনওয়ার ফারুক
প্রথম মঞ্চায়ন-বর্ষ: ২০০০
একটি 'ঢাকা থিয়েটার' প্রযোজনা

সেলিম আল দীন (১৮ আগস্ট ১৯৪৯–১৪ জানুয়ারি ২০০৮) শক্তিশালী নাট্যকার। স্বাধীনতা ও বিজয়ের পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে নাটকের যে অগ্রগতি তার কাণ্ডারিদের অন্যতম তিনি। তাঁর নাটকে প্রধানত গ্রামীণ মানুষের পারস্পরিক সহমর্মিতা, ঈর্ষা, শোষণ, সংগ্রাম, পরাভব, অশ্লীলতা, কাম, প্রেম, প্রতিশোধ, নিষ্ঠুরতা, আত্মত্যাগসহ জীবনের এক বিরাট ছবির উন্মোচন ঘটে। সে ছবি বহুব্রীহি-জীবনের উচ্ছল-গভীর-বীভৎস-সুন্দররূপের। লোকজ-শিল্পচর্চার আঙ্গিকের সঙ্গে আধুনিক-নিরীক্ষার মেলবন্ধন করতে চেয়েছেন তিনি। 'ঢাকা থিয়েটারে'র প্রযোজনা প্রাচ্য-তে তাঁর এ উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা আরও বৃহৎ ও জটিল।

সেলিম আল দীনের নাটকে বহমান গ্রামীণ-জীবন-প্রবাহের চেয়ে তার ঘনীভূত রূপটি অর্থাৎ উৎসব-অনুষ্ঠানাদি অধিক পরিস্ফুট। লোকজ-নাট্য-আঙ্গিক ও আঞ্চলিক-ভাষাকে অবলম্বন করে হলেও তাঁর নাটকের বর্ণনা, চিত্রকল্প, উপমা ও উপস্থাপনা সহজ নয়। ফলে যে সাধারণ-মানুষের চর্চিত শিল্প-আঙ্গিক, ভাষা, জীবন ও পরিবেশ নিয়ে এই নাটকের রচনা, তাদের কাছে নাটকটি অনেকাংশে দুর্বোধ্য হবে বলা যায়। এটি শহুরে শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত নাট্যসচেতন দর্শকের জন্য একটি উপভোগ্য নাটক।

সাপের কামড়ে সদ্য-বিবাহিত এক বউয়ের করুণ মৃত্যুবিষয়ক একটি ছোট্ট উপাখ্যান নিয়ে এই নাটক। উপাখ্যানটির অন্তরালে শোষক ও শোষিতের মধ্যেকার যে সম্পর্ক নাটকটির কেন্দ্রীয়-বিষয়, বিচিত্র পার্শ্ব-ঘটনার ঘনঘটায় তা প্রায় ঢাকা পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এর মূল আকর্ষণ নাট্যকারের হাতে প্রাচীন গ্রামীণ আচার-অনুষ্ঠানাদির হৃদয়গ্রাহী চিত্রায়ণ ও 'ঢাকা থিয়েটারে'র কুশীলবদের অপূর্ব অভিনয় ও উপস্থাপনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে।

মঞ্চস্থ প্রাচ্য মূল নাটকটি অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে কম। নাটকটির মৌলিক বিষয়, শোষক ও শোষিতের মধ্যেকার সম্পর্ক, প্রযোজনাটিতে খুবই প্রচ্ছন্ন। মূল-নাটকটি মনোযোগসহ পাঠ করলেই কেবল এই অংশটি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু নাট্যকারের অহিংসবাদী জীবনদর্শন একে পরিণতিতে দংশন করে পালায়। অথচ শোষক-শোষিতের সম্পর্কের এই গুরুত্বটি বিবেচনা না করলে

তাঁর নাটকে প্রধানত গ্রামীণ মানুষের পারস্পরিক সহমর্মিতা, ঈর্ষা, শোষণ, সংগ্রাম, পরাভব, অশ্লীলতা, কাম, প্রেম, প্রতিশোধ, নিষ্ঠুরতা, আত্মত্যাগসহ জীবনের এক বিরাট ছবির উন্মোচন ঘটে। সে ছবি বহুব্রীহি-জীবনের উচ্ছল-গভীর-বীভৎস-সুন্দররূপের

নাটকটিতে শেষের ভিটে খননের অংশটি হয় শুধু একটি রহস্যময় মুখরোচক শব্দ, জীবনের খনন।

প্রাচ্য-তে জীবন ও জগতের বৈপরিত্যের মাঝে ঐক্যের-সূত্র চিত্রিত। একটা ট্র্যাজিক সত্য-কাহিনি নিয়ে 'মনসাপুরাণের উল্টা দিকটা' বয়ান করেছেন সেলিম আল দীন। কন্যার বাড়িতে বরযাত্রীদের খাওয়ার অনুষ্ঠান থেকে নাটকের শুরু। বরযাত্রা নিয়ে ফেরার পথে সোমেজ মামা বলেন, 'বিবাহযাত্রায় আর শেষযাত্রায় আকাশ-পাতাল মিল।' বাসরঘরে সর্পদংশনে নববধূ নোলকের মৃত্যুর ফলে অতি-দরিদ্র কৃষক 'উলট লখিন্দার' সয়ফর চানের বরযাত্রা শবযাত্রায় পরিণতি পায়।

হত্যাকারী সাপটিকে খুঁজে পেতে সয়ফর সারারাত ভিটে খুঁড়ে যখন ভোরের আলোয় হঠাৎ সাপটিকে দেখতে পেল, সে দেখে, 'সাপটি তার দিকে তাকিয়ে সতর্ক হয়। ... একবার বামে একবার ডানে নড়ে নড়ে ফণার প্রতাপ দেখায়। প্রতাপ না সৌন্দর্য-রাঙা বাহার। ফাল্গুনের ভোরের রাঙা-মেঘাবলি বিচিত্রিত কমলাবর্ণের ফণা। সে উদ্ভিদ। মাটি ভেদ করে উঠেছে। বৃক্ষরাও ভূমিভেদী বিচিত্র ফণা। সে ফণা দোলে চিকন-বাতাসে। কোনটা তবে কী থেকে পৃথক হবে। হায়, সয়ফর দ্বিখণ্ডিত হয়। তবে কে কার মতো। কিন্তু এই ঐক্য ক্রোধের কাছে এসে সরে যায়।'

তারপর সয়ফরের ক্ষুরধার ছেনি ও গোক্ষুর সাপের ক্রুদ্ধ-ফণার মধ্যে চলে বুদ্ধিমত্তা, ক্ষিপ্রতা, আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধের ভয়ানক লড়াই। তখন প্রশান্ত-জলস্রোতের মতো শাদা শাড়িপরা বৃদ্ধা দাদী এসে সয়ফর ও বাস্তুসাপটির মাঝে এক অনতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি করেন। এক পাড়ে প্রতিশোধ-পরায়ণ সয়ফর, অন্যপাড়ে হত্যাকারী সাপ। 'যে যার স্থানে থাকে। এই ছেনি এত দীর্ঘ না যে সে এক গাঙ পারায়া দিগন্তরেখার কাছে উদ্যত সাপের মাথা কাটবে। থর থর করে কাঁপে সে। ... সাপটি ধীরে ফণা নামায়। তারপর লোকের নতুন কবরের ওপর দিয়ে শ্লথগতিতে বন্য-অন্ধকারে চলে যায়। সৌন্দর্য, ভয় ও রহস্য সবার অন্তরে সম্ভ্রম জাগায়। হত্যা ভুলে যায় তারা।'

নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফ লিখেছেন, 'প্রাচ্য'র দর্শন হলো প্রাচ্য-জনপদের হাজার বছরের জীবনদর্শনের একটি প্রতিফলন। বিষয়টিকে আমি এভাবেই দেখেছি। কিন্তু সেলিম-সৃষ্ট উপাখ্যানটি নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ। ক্ষমার শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতেই হয়ত সেলিম এমন একটি মর্মান্তিক গল্পের আশ্রয় নিয়েছে'

নাট্যকারের বক্তব্য, 'আমার মনে হয়েছে জীবনের তীব্র মুহূর্তে ক্রোধ, প্রতিহিংসা শেষ-অবধি প্রকৃতি-সংলগ্ন হয়ে যায়।'

নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফ লিখেছেন, "'প্রাচ্য'র দর্শন হলো প্রাচ্য-জনপদের হাজার বছরের জীবনদর্শনের একটি প্রতিফলন। বিষয়টিকে আমি এভাবেই দেখেছি। কিন্তু সেলিম-সৃষ্ট উপাখ্যানটি নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ। ক্ষমার শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতেই হয়ত সেলিম এমন একটি মর্মান্তিক গল্পের আশ্রয় নিয়েছে।"

কিন্তু এখানে ক্ষমা একদিকে অক্ষমতাহেতু শোষককে শোষিতের ক্ষমা, অন্যদিকে বদ্ধমূল-সংস্কারের বলি। নাটকটিতে জিতু মাতব্বর ও দংশনকারী বাস্তুসাপটি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। নিচের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হবে।

সয়ফর, জিতু মাতব্বরের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিয়ে একটি গাভী কিনেছিল। কিন্তু 'সে জানত না দুধ বেচে মহাজনের সুদ শোধ করা যায় না।' শেষমেশ দশ ডিসিম জমি দিয়ে গাভীটিকে মাত্র দুইহাজার টাকায় জিতু মাতব্বরের হাতে তুলে দিয়ে তবে সে জেল-পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পায়। 'অসম্মান এই যে', গ্রামের সালিশে শাস্তি নির্ধারিত হয়েছিল বলে 'এ দুধ কামলাখাটা সয়ফরকে জিতু মাতব্বরের বাড়িতে দুইয়ে দিয়ে আসতে হতো।' আর অন্যদিকে সাপটি কেড়ে নিল তার জমির চেয়ে দামি সবুজ নিশাপরী নোলককে। সয়ফরের কণ্ঠে শোনা যাক, 'অসম্মান করছে জগৎ-সংসার আমারে। বেবাকে আঙ্গুল তুইলা দেখাবে ঐ যে ব্যাটা রমু নাইঠ্যালের পুত যায়। বিয়ার রাইতে সাপে কাটছে বউ। জিতু মাতব্বরের বাড়িতে গিয়া গরু বেইচা নিজেই দুধ দোহায়া তাগরে রান্নাঘরে তুইলা দিয়া আসছে। কব ঐ যে যায় বাপের-দিন্যা দশ ডিসিম বান্ধা দিয়া বিয়া করছিল।'

সয়ফর তার বিয়ের খরচের টাকা ধার নিয়েছিল জিতু মাতব্বরের ছেলে আইজলের কাছ থেকে। বরযাত্রায় ফেরার পথে একবার অকস্মাৎ মতিভ্রমবশত সে মৃত জিতু মাতব্বরকে অদূরে দেখতে পায়, তার শেষ রবিশস্যের বন্ধকি জমিটা কেড়ে নিতে

মৃত্যুশয্যায় শায়িত জিতু মাতব্বর সয়ফরসহ গ্রামের জনে জনের কাছে ক্ষমা চায়। সয়ফরের দিকে শীর্ণ হাত বাড়িয়ে সে বলে, 'সব কাইড়া নিছি তর, মাফ কইরা দে। ... বেবাক মাতব্বর যা করে আমিও তাই করছি। জমি থাকলেই কেনাবেচা থাকে সয়ফর। আমি যাইতাছি। যে দশ ডিসিম জায়গা, গাইগরু এই বছর কাইড়া নিছিলাম বেবাক ফেরত দিলাম

এসেছে। হত্যাকারী সাপটিকে খুঁজতে গিয়ে এমনি ভ্রমের শিকার হয়ে সে বৃথা একটি ছায়ার ফণাকে ছেনি চালিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে। সয়ফর একবার জিতু মাতব্বরকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। এক ঘনকৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘের রাতে ক্ষুরধার ছেনি হাতে আকন্দ গাছের ঝোপে লুকিয়েছিল সে জিতু মাতব্বরের হাট থেকে ফেরার অপেক্ষায়। কিন্তু পারেনি, জিতু মাতব্বরের টর্চ ও ছাতা নিয়ে ফিরছিল তার জামাই। নোলকের হত্যাকারী সাপের সন্ধানে সে ভিটার গর্তে সাপটিকে দেখে তার ক্ষুরধার ছেনি ঢুকিয়ে দেয় সাপের আঁইশে। ছিঁড়ে-খুঁড়ে যা আনে তা আদত সাপটি নয়, তার ছোলঙ-মাত্র।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত জিতু মাতব্বর সয়ফরসহ গ্রামের জনে জনের কাছে ক্ষমা চায়। সয়ফরের দিকে শীর্ণ হাত বাড়িয়ে সে বলে, 'সব কাইড়া নিছি তর, মাফ কইরা দে। ... বেবাক মাতব্বর যা করে আমিও তাই করছি। জমি থাকলেই কেনাবেচা থাকে সয়ফর। আমি যাইতাছি। যে দশ ডিসিম জায়গা, গাইগরু এই বছর কাইড়া নিছিলাম বেবাক ফেরত দিলাম। আমার পোলা আইজল থাকল। তুইত বছর ঘুরতে আবার জমি বেচবি, তয় ঐ দশ ডিসিম তুই আইজলের কাছেই বেচিস। মাফ করছিস ত বাবা।'

জিতু মাতব্বরের কবরের বাঁশের ছাউনি সয়ফরের বাবার কবরের বাঁশঝাড় থেকেই কেটে বানানো হয়েছিল। শীতকালে মাসকলাই বুনেছে সয়ফর জিতু মাতুব্বরের 'নতুন কবরের পর যাতে কবরের গহ্বরে স্বর্গ-সবুজের আভা পৌঁছায়।' সে 'গর্তে সান্দায়ে' গিয়েছিল সকলের সম্ভ্রম নিয়ে। আর নাটকের শেষে দাদীর বাস্তুসাপ-সংক্রান্ত কুসংস্কার ও নাট্যকারের নিসর্গ চেতনার সুবাদে সাপটিও সকলের সম্ভ্রম জাগিয়েই আপন গর্তে সান্দায়ে যায়।

সাপ বাস করে ইঁদুরের গর্তে। সয়ফর নিজের বন্ধকী জমিটার মতো শোষণের এই গর্তে প্রবেশ করে নতুন করে মহাজনের সাথে তার সম্পর্কটা আবিষ্কার করে। সয়ফর বলে, 'গর্ত থাকলে সাপ আছে। সাপ থাকলে ইন্দুর থাকে। ইন্দুর থাকে ধানের পিছে। ধান থাকলে ক্ষেত থাকে। ক্ষেত থাকলে ভিটা। ভিটার ওপর আকাশ ও ফণা।' এই 'ফণা' কি শুধু নিসর্গের শোভা, না মহাজনের চোখ? নাটকে কথক বলে, 'এভাবে নিসর্গের সঙ্গে মৃত্যুকে, সাপকে অনিবার্যসত্তায় লীন করে ফেলে সয়ফর।' এভাবে সেলিম আল দীন আমাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেন। সেলিম আল দীন বড়-মাপের শিল্পী বলেই তাঁর সয়ফর চান চেতনাগতভাবে জিতু মাতব্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং বৃদ্ধা দাদীর বাস্তুসাপ-সংক্রান্ত কুসংস্কারের সুযোগে বেঁচে যায় সাপটি। কিন্তু কেন সয়ফরের ভিটে খননের বিরুদ্ধে 'এই আকাশ-স্পন্দিত নক্ষত্র নিয়ে সুপারির গাছটায় দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে না না না?' এই বেঁচে যাওয়াকে বৃহত্তর

সেলিম আল দীন আধুনিক নাট্যকার। তাঁর কাছে কেবল অতীতের হুবহু চিত্র পেলে প্রত্যাশা পূরণ হয় না। কোন কোন শক্তির বলে সেই পুঁথিপড়া মনোরম অতীত ও নিষ্ঠুর-শোষণের রূপ বদলে যায় ও বর্তমানে তা কী রূপ পরিগ্রহ করে তা তাঁর নাটকে অনুপস্থিত। এই শোষণপ্রক্রিয়া এখন এত সূক্ষ্ম ও জটিল যে শোষণকারীকে জিতু মাতব্বরের মতো চোখের সামনে যায় না। প্রয়োজন শোষকের প্রকৃত চিত্রটা তুলে ধরে মানুষের চেতনা ও আশার প্রদীপ জ্বালানো। দেখা যায়, সেলিম আল দীনের নাটকে আমরা অতীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করি, ফেলে-আসা দিনগুলোর জন্য বিষণ্ন হই

অর্থ দিতে গিয়ে সমাজের শোষণরীতিকে এভাবে বিশ্ব-প্রকৃতির রীতির সঙ্গে একাকার করে দেন তিনি।

ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে সয়ফর একটি মৃত ইঁদুর টেনে বের করে। 'হত্যাকারী সাপ লোককে দংশন করে পালাবার সময় এই ইঁদুরটাও শ্যাষ করে দিয়ে গেছে।' তাই বলে জিতু মাতব্বর সয়ফরকে শোষণ করে–পালাবার পথে নয়। তারপর 'সে চিৎ করে শোয়ায় ছিন্নভিন্ন ইঁদুরটাকে। ... সে খোঁড়া বন্ধ করে একদৃষ্টে চিৎ হয়ে ইন্দুরটাকে বড় হতে হতে তার সমান হয়ে যেতে দেখে। এমনকি ইন্দুরের স্থলে নিজেকেও দেখে। ঠিক এই রকম নগ্ন ছিন্নভিন্ন শরীর। হঠাৎ সে বলে, আইজল মিয়া বন্ধকী জমিখান কিনলে তবে আমার থাকে কী? সয়ফর নিজেকে ইঁদুরের সাথে একাত্ম করে রাখে। এখানে নাট্যকার বলছেন, 'কিন্তু চার-পায় ইন্দুর আর আঁইশওয়ালা কালনাগ এক নয়। একটা শিকার অন্যটা শিকারী। চির চির অযুত নিযুত বৎসর এই রীতি।'

না। সভ্যতার বিকাশে একটা স্তরে সমাজে শোষণের উদ্ভব, অন্য একটা উন্নতস্তরে আবার তার বিলুপ্তিও অবশ্যম্ভাবী। শোষণব্যবস্থা সমাজের চিররীতি নয়।

প্রাচ্য-তে জিতু মাতব্বরের মৃত্যুর পর তার ছেলে আইজল তার স্থান দখল করে। সেলিম আল দীন আধুনিক নাট্যকার। তাঁর কাছে কেবল অতীতের হুবহু চিত্র পেলে প্রত্যাশা পূরণ হয় না। কোন কোন শক্তির বলে সেই পুঁথিপড়া মনোরম অতীত ও নিষ্ঠুর-শোষণের রূপ বদলে যায় ও বর্তমানে তা কী রূপ পরিগ্রহ করে তা তাঁর নাটকে অনুপস্থিত। এই শোষণপ্রক্রিয়া এখন এত সূক্ষ্ম ও জটিল যে শোষণকারীকে জিতু মাতব্বরের মতো চোখের সামনে যায় না। প্রয়োজন শোষকের প্রকৃত চিত্রটা তুলে ধরে মানুষের চেতনা ও আশার প্রদীপ জ্বালানো। দেখা যায়, সেলিম আল দীনের নাটকে আমরা অতীতের প্রতি

প্রবল আকর্ষণ অনুভব করি, ফেলে-আসা দিনগুলোর জন্য বিষণ্ন হই, শিকড়বিচ্ছিন্ন-সত্তার গভীরে ছিন্নসূত্রের টানও পাই; কেবল এগিয়ে যাবার প্রেরণা পাই না।

নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফ বেশ জটিল একটি নাটককে অত্যন্ত সহজ-সরল উপকরণ ও সংযত উপস্থাপনাশৈলী দিয়ে উপভোগ্য করে তুলেছেন। প্রাচ্যর অনেক দৃশ্য, যেমন, মৃত্যুশয্যাশায়ী জিতু মাতব্বর, নববধূর বিদায়, মাতব্বরকে হত্যার জন্য ছেনি-হাতে সয়ফরের বৃথা অপেক্ষা, গুদারাঘাটের বাকবিতণ্ডা, নববধূকে ঘিরে কিশোরীদের সরল হাস্যরস আশ্চর্য নৈপুণ্যে ও আন্তরিকতার সাথে অঙ্কিত ও অভিনীত। আঞ্চলিক-ভাষায় রচিত সেলিম আল দীনের নাটকের সংলাপ গীতল, চিত্র-কল্পময়, শক্তিমান ও হৃদয়ের অন্তস্থলস্পর্শী। নাট্যকারের ঐতিহ্যসংলগ্নতা, জীবনঘনিষ্ঠতা ও শিল্পীদের অভিনয়গুণে নাটকটির অনেক দৃশ্য ও সংলাপের স্মৃতি বহুদিন দর্শকের মনের আয়নায় আঁকা থাকবে। ■

শিল্পী অঞ্জনার ‘অন্তশৈলী’

শিল্পের সরল ক্যানভাস

নাজনীন সাথী

অঞ্জনা সোম কতগুলো জানালা খুলে দেন আমাদের মনের। সেই জানালা দিয়ে আমরা বাংলার চিরন্তন অন্তশৈলীকে নতুনভাবে নতুন আলোয় অবলোকন করি। শিল্পীর শিল্পকর্ম তৈরিতে মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে উপকরণের ব্যবহারে। অনেকের কাছে যা পরিত্যক্ত বলে মনে হয়। যেমন, পাথর, শলাকা, নারকেলের মালা, মাটির পাত্র, ইত্যাদি। অবহেলায় ছড়ানো ছিটানো বস্তুগুলোকেই পরম মমতায় শিল্পী ঠাঁই দিয়েছেন নিজের তৈরি শিল্পকর্মে, এটাই অঞ্জনার কৃতিত্ব

৩১ ডিসেম্বর ২০২১ সপরিবারে উপস্থিত হয়েছিলাম ঢাকায় লালমাটিয়ার ‘শিল্পাঙ্গন গ্যালারি’তে শিল্পী অঞ্জনা সোমের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ‘অন্তঃশৈলী’ দেখতে। আমাদের দু পরিবারের ছেলেমেয়ের একসঙ্গে লেখাপড়ার সূত্রে পরিচয়। আমাদের অনেক সকাল-দুপুর কিংবা বিকেল কেটেছে একসাথে। স্বল্পবাক এ নারী আমাদের বহুজনের আলাপের মধ্যে নীরব শ্রোতা। এই নীরবতা তার পর্যবেক্ষণ কিংবা শ্রবণশক্তিকে ঋদ্ধ করে–তা এখন নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

অঞ্জনা সোমের ‘অন্তশৈলী’ প্রসঙ্গে গ্যালারির পরিচালক রুমি নোমান ক্যাটালগের শুরুতে বলেছেন: আমরা জানি ইচ্ছে থাকলে কি না করা যায়, কিন্তু শিল্প এমন হয়। ... আর অঞ্জনা সেই কাজটি করেছেন শুধু পর্যবেক্ষণ করে।

অন্যত্র রশিদ আমিন বলেছেন: অঞ্জনার শিল্পকে আমরা যদি ব্যাখ্যা করি প্রথমেই বলতে হয়, সহজাত ও রূপজাত। সরল আঙ্গিকের ভাবনাগুলোকে রূপশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে।

সচক্ষে প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে। এত সাবলীল ও নান্দনিক অনুভবে শিল্পী প্রতিটি শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন অত্যন্ত যত্ন ও ধৈর্য্য নিয়ে। যা দর্শককে মুগ্ধ করে। মাধ্যম হিসেবে শিল্পী হাতের কাছে পাওয়া জিনিসকে ব্যবহার করে তার মাঝে রং ও অন্যান্য উপাদানে সুন্দরের অভিব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন। এদিক থেকে যে কাউকে সৃজনকর্মে উৎসাহিত করবে। ঘরে বসে দৈনন্দিন ঘরসংসারের কাজের ফাঁকে একটু অবসাদের সময়টুকুও যে রাঙিয়ে তোলা যায় তার উদাহরণ তো শিল্পী অঞ্জনা সোম আমাদের দেখিয়ে দিলেন। ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৬ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত লালমাটিয়ার ‘শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে’ এই শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মনপাখি, বিশ্বাস, প্রকৃতিপ্রেম, সরা চিত্রবন্দী রং, আলোতে আলোতে আনন্দে এবং রঙীন বৃষ্টি শিরোনামের বিভিন্ন শিল্পকর্ম।

মন চলে যায় সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার প্রতাপনগর গ্রামে বেড়ে ওঠা অঞ্জনা সোমের বসতভিটায়–যেখানে সন্ধ্যেবেলায় গোলাঘরের সামনে শিউলিতলায় গোল গোল চোখে চেয়ে আছে লক্ষ্মীপেঁচা। হারিকেনের আলোয় বই পড়ছে কিশোরী অঞ্জনা–আমাদের আজকের শিল্পী। বড়দিদি অমরী পরম আদরে স্নেহের ছোটবোনকে বানিয়ে দিচ্ছেন পুতুলের জামাকাপড়। সেখানে অগ্রহায়ণে ভবিষ্যৎ শিল্পী অঞ্জনা মা-বোনের সঙ্গে আল্পনা আঁকার পাঠ গ্রহণ করছেন। যদিও সেসব আজ বদলে গেছে। তারপরও শিল্পী তার মনের আয়নায় দেখতে পান অতীতকে।

অঞ্জনা সোম কতগুলো জানালা খুলে দেন আমাদের মনের। সেই জানালা দিয়ে আমরা বাংলার চিরন্তন অন্তশৈলীকে নতুনভাবে নতুন আলোয় অবলোকন করি। শিল্পীর শিল্পকর্ম তৈরিতে মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে উপকরণের ব্যবহারে। অনেকের কাছে যা পরিত্যক্ত বলে মনে হয়। যেমন, পাথর, শলাকা, নারকেলের মালা, মাটির পাত্র, ইত্যাদি। অবহেলায় ছড়ানো ছিটানো বস্তুগুলোকেই পরম মমতায় শিল্পী ঠাঁই দিয়েছেন নিজের তৈরি শিল্পকর্মে, এটাই অঞ্জনার কৃতিত্ব।

বিশেষভাবে যা উল্লেখ না করলেই নয় তা হচ্ছে, শিল্পী কিরিটি রঞ্জন বিশ্বাস এবং তার মেয়ে অন্বিতা বিশ্বাসের কথা। তারা দুজনেই অঞ্জনার স্বামী ও কন্যা পরিচয় থেকে বেরিয়ে এসে শিল্পীর শিক্ষক ও সহযোগির ভূমিকা পালন করেছেন পরম নিষ্ঠার সাথে। আমরা এই শিল্পী পরিবারের উত্তোরোত্তর সাফল্য কামনা করি। ■

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি

অ ন্ত

শৈলী

বিজ্ঞানি জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে আলোচনা